

প্রি হুইলার যানবাহনের নিবন্ধন-
লাইসেন্স দাবি : পৃষ্ঠা ৩

মবের নামে কী হচ্ছে?
: পৃষ্ঠা ৫

শ্রম সংস্কার কমিশন : প্রত্যাশা ও
দায় : পৃষ্ঠা ১২

নারী নির্যাতন বন্ধের দাবি :
পৃষ্ঠা ১৬

অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বাসদের
সমাবেশ অনুষ্ঠিত : পৃষ্ঠা ১৬

মাইলস্টোন স্কুলে প্রশিক্ষণ
বিমান বিধ্বস্ত হয়ে হতাহতের
ঘটনায় বাসদ ও ভ্যানগার্ড-
এর পক্ষ থেকে শোক ও
সমবেদনা

দেশের সার্বভৌমত্ব ও অর্থনীতির স্বার্থে

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বন্দর পরিচালনা করতে হবে ২৭-২৮ জুন ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডমার্চ অনুষ্ঠিত

● নিউমুরিং টার্মিনালসহ চট্টগ্রাম
বন্দর ব্যবস্থাপনা বিদেশিদের
না দিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায়
পরিচালনা কর

● রাখাইনে করিডোর দেওয়ার
তৎপরতা বন্ধ কর

● স্টারলিংকের সঙ্গে সম্পাদিত
চুক্তি বাতিল কর

● মার্কিন ও ভারতসহ
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে
সম্পাদিত চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশ
ও অসম চুক্তি বাতিল কর

‘মা-মাটি, মোহনা-বিদেশিদের দেব না’—এই
স্লোগানে বামপন্থি দল, জোট ও সংগঠনের
সমন্বয়ে গঠিত ‘সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিক
জনগণ’-এর ব্যানারে ২৭ জুন ‘২৫ সকালে চার



দফা দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে
ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডমার্চ শুরু হয়ে ২৮ জুন চট্টগ্রাম
বন্দরে সমাবেশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

রোডমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশের শুরুতে
সংগীত পরিবেশন করে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক
এক্যের সদস্যবৃন্দ।

রোডমার্চে অংশ নেওয়া নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন
দাবির স্লোগান সংবলিত ব্যানার, প্ল্যাকার্ড-

ফেস্টুন বহন করে। এসবের মধ্যে দাবি রয়েছে
‘ইন্টেরিম সরকার সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদার’,
‘বন্দর-করিডোর বিদেশিদের দেব না’,
জাতীয় স্বার্থবিরোধী সকল অসম চুক্তি বাতিল
কর’, ‘মার্কিন ভারতসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী
আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও’, ‘চট্টগ্রাম
বন্দর বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না’,
‘মার্কিন কোম্পানি স্টারলিংকের সঙ্গে চুক্তি বাতিল

কর’ ‘বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানো’ প্রভৃতি স্লোগান।
প্রথম দিন জাতীয় প্রেসক্লাবে সমাবেশ শেষে
মিছিল পল্টন-নুর হোসেন স্কয়ার, গুলিস্তান হয়ে
বঙ্গভবনের দক্ষিণ পাশে শেষ হয়। রোডমার্চে
অংশগ্রহণকারীরা বাস যোগে যাত্রা শুরু করে
চিটাগাং রোড, সোনারগাঁও মোগরাপাড়া, মুন্সিগঞ্জ
জেলার জামালদী, কুমিল্লার চান্দিনায় পথসভা
এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দুর্বৃত্ত সরকার উচ্ছেদ হলেও, নতুন দুর্বৃত্তদের দুর্বৃত্তপনা চলছে

এক দুর্বৃত্ত উচ্ছেদ করে পুরোনো একই ব্যবস্থা
বহাল রাখলে কিংবা দুর্বৃত্তপনা চলতে দিলে বহু
শাখা-প্রশাখায় নতুন দুর্বৃত্ত গজিয়ে উঠতে থাকে।
কালক্রমে পুরোনো দুর্বৃত্তদের ফিরে আসার,
পুনর্বাসিত হবার বা নতুন মোড়কে স্থান করবার
জায়গাও তৈরি হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে নতুন
-পুরাতনের পার্থক্য মাত্র ঘুচতে থাকে। নতুন
দুর্বৃত্ত তৈরি হতে থাকে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দূর্বৃত্ত ইচ্ছাপূরণের
গোপন আকাঙ্ক্ষা, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার
সমন্বয়হীনতা, সামর্থ্যহীনতা এবং এর দৃশ্যমানতা
আয়োজন ও কার্যকর পদক্ষেপে এর দৃষ্টান্ত
না থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার বদলে
নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। দৈনিক দুর্ঘটনায় যত
মানুষ মারা যায় তার চেয়ে বেশি যায় নৃশংসতায়।
আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। সবচেয়ে ভীতিকর
পরিবেশে রয়েছে ঘরে বাইরে নারীরা। বিচ্ছিন্ন
ঘটনা বলে পাশ কাটানোর চেষ্টার ফলে নৃশংস
সহিংস ঘটনা নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলেছে।
গোষ্ঠীর সহিংস তাণ্ডব আর গণদাবির চাপ ও
মরণপণ প্রচেষ্টাকে এক সমীকরণে ফেলা হচ্ছে।
ন্যায্যতা আর খেলালখুশিপনাকে দেশের স্বার্থের
সম্পর্ক আর ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের নিষ্ঠুরতাকে এক
এবং অভিন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। ফলে এক সময়
গণদাবি আর মব সন্ত্রাসকে এককাতারে ফেলে

রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নে শাসকশ্রেণির ইচ্ছামাফিক
পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হবে। যা ইতিমধ্যে
দেখা যাচ্ছে গত ৫৪ বছরে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণি
তাদের গোষ্ঠী সেবার বাইরে জনস্বার্থে যা পারেনি
এখন নতুন পোশাকি বুর্জোয়ারা এক বছরে জানান
দিয়ে দিয়েছে যে এরাও গোষ্ঠী কিংবা বংশবদ
সেবার বাইরে অপূর্ণিত গণআকাঙ্ক্ষা পূরণে সফল
হবে না। কারণ এরা পরিচয়ে যত আলাদাই
হোক শ্রেণিতে এক। এ কথাটা ভুলিয়ে দিতে
তারা কথিত জাতীয় ঐক্য, ইনকুসিড সোসাইটি,
বহুত্ববাদ ইত্যাদি সোরগোল তোলে। কিছুটা
সফলও হয়। শোষিত জনগণ তাদের স্বীয় অস্তিত্ব
ভুলে এদের পিছনে জড়ো হয়। তারপর শুরু হয়
বুর্জোয়া-পাতি বুর্জোয়া দলসমূহের বেড়াভাঙা
ক্ষমতার লড়াই।

জনতার শক্তির ভাগবাটোয়ারা শুরু হয়
অর্থবিত্ত-প্রচার, জাতীয়-আন্তর্জাতিক মদদ
আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদিতে। হাত
বদল, হাত সাফাই-নতুন বোতলে পুরোনো মদ
ঢালা ইত্যাদি কর্মে লুটেরা বদল ঘটতে থাকে।
পুরোনো লুটেরাদের অনেকে গা-বাঁচিয়ে শামিল
হয়। সাম্রাজ্যবাদী সূতার টানে কিছু অদলবদল
ঘটে। তারপরও শ্রেণি হিসাবে লুটেরাদের জন্য
পৌষ মাস আর জনতার জীবনে নামে সর্বনাশ।
চলমান জগৎ-সংসারে মৌলিক কিছু বিষয়

ছাড়া চিরকালীন অপরিবর্তনীয় কিছু থাকে
না। স্বতঃস্ফূর্ততায় এবং পরিকল্পিত পদক্ষেপে
পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলমান থাকে। তবে সব
পরিবর্তনই প্রগতিমুখী হয় না, প্রতিক্রিয়াশীলতায়ও
আচ্ছন্ন হয়। নির্ভর করে কোন শ্রেণি কোন স্বার্থে
এবং কীভাবে তা সম্পন্ন করার পথ নেয়। ৫ ভাগ
লোকের স্বার্থ দেখলে ৯৫ ভাগ লোকের স্বার্থ হানি
হয়। ৯৫ ভাগের স্বার্থ দেখলে ৫ ভাগের আঙুল
ফুলে কলাগাছ হওয়া অদৃশ্য হয়। এখানেই
পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের পার্থক্য। বুর্জোয়া
শাসন আর শ্রমজীবী শ্রেণির শাসনের তফাৎ।
বৈষম্যবিরোধী চেতনা যে সমাজতন্ত্রের চেতনা
এই সহজ সত্যকে জাতীয়-আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ারা
এতটাই জটিল করে তুলেছে যে, নব প্রজন্মের
পক্ষে তা ধরা খুবই কঠিন। অন্তহীন সমস্যায়
ডুবে থাকা সাধারণ মানুষের কাছে এখন অন্তর্বর্তী
সরকারের সংস্কার বাণী বেসুরো বাজনায় পরিণত
হয়েছে। কারণ অভাবে-অনটনে, ভয়ে-সন্ত্রাসে,
অশিক্ষা-কৃষিক্ষার প্রকোপে, উড়ে আসা জুড়ে
বাসাদের দুর্নীতি ও প্রতাপ তাণ্ডবে মানুষ ক্ষুব্ধ ও
আশাহত।

টিনের ঘরের চালে জং ধরা টিন বদলিয়ে নতুন
টিন লাগানো এক ধরনের সংস্কার। আবার টিনের
ঘর পাল্টিয়ে বহুতল ভবনের ডিজিপ্রস্তর স্থাপন
করাও একটা সংস্কার। প্রথমটা গতানুগতিক,

দ্বিতীয়টা মৌলিক। উদ্দেশ্যের সত্যতার কথা
বাদ দিলেও এখন চলছে গতানুগতিক সংস্কারের
মুসাবিধা। ‘২৪-এর অভ্যুত্থানের চেতনা
গতানুগতিকতার অনুমোদন দেওয়া না, আমূল
সংস্কারের দাবি রাখে যা অন্তর্বর্তী সরকারের
অসাধ্য। সেই পথ রচনার শক্তি নির্মাণে শ্রমজীবী
মানুষসহ গুণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এগিয়ে আসতে
হবে।

এখন ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকে ‘২৪-এর
অভ্যুত্থানের সমান্তরালে টানা বা তাকে উপেক্ষায়
খাটো করা বা আওয়ামী লীগ বা মুক্তিযুদ্ধকে
অভিন্ন করে আওয়ামী অপরাধকে মুক্তিযুদ্ধের
ঘাড়ে চাপানো বাস্তবে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে
দেওয়ার শামিল। এ কাজে জুলাই ঘোষণা,
দ্বিতীয় রিপাবলিক, নতুন স্বাধীনতা ইত্যাদির
মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ঐতিহ্য, অপূর্ণিত
আকাঙ্ক্ষাসমূহকে বিকৃত বিংবা বিস্মৃতির অতলে
তলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আওয়ামী লীগ
মুক্তিযুদ্ধের বাণিজ্য করেছে, স্বাধীনতারবিরোধীরা
তাদের অবস্থান জায়েজ করার অপকৌশলে
নেমেছে। শোষিতশ্রেণির ঐক্যের বদলে
লুটেরাশ্রেণির ঐক্যের হাঁকডাক এখন গৃহযুদ্ধের
দিকে বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির দিকে দেশকে
ঠেলে দেওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী
শকুনরাও গরু মরার অপেক্ষায় আছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বন্দর পরিচালনা করতে হবে।। মানবিক করিডোর দেওয়া চলবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে। সন্ধ্যায় কুমিল্লা টাউন হল মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেনীতে রাতযাপনের পর দ্বিতীয় দিন, ফেনী শহরে মিছিল ও শহিদ মিনারের সামনে পথসভা, বারৈয়ারহাট, মিরসরাই, সীতাকুণ্ড, কর্ণেল হাটে সমাবেশ-মিছিল, চট্টগ্রাম বন্দরের ফটকে সমাপনী সমাবেশে মিলিত হয়।

২৭ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ বাম জোটের সমন্বয়ক ও সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সের উদ্বোধনী বক্তব্যের পর রোডমার্চের যাত্রা শুরু হয়।

রোডমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাসদ-এর উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবি'র সাবেক সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যসচিব এম এম আকাশ। ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডমার্চ কর্মসূচিতে একাত্মতা পোষণ করেছেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তাঁরা শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি। এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বাম ছাত্র সংগঠন, নারী সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনও এই কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লায় জনসভা

রোডমার্চে অংশগ্রহণকারীরা সন্ধ্যায় কুমিল্লা শহরের টাউন হল মাঠে পৌঁছান। সেখানে প্রথমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিবাদী গান, নাটকসহ বিভিন্ন পরিবেশনার পরে জনসভা শুরু হয়। সিপিবি'র কুমিল্লা জেলার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুজাত আলীর সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তব্য দেন বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, সিপিবি'র সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন নাসু, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের আহ্বায়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশররফা মিশু, বাংলাদেশের সোশ্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, বাসদ (মাহবুব)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহিনউদ্দীন চৌধুরী লিটন, সচেতন রাজনৈতিক ফোরাম কুমিল্লার সমন্বয়ক শেখ আবদুল মান্নান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মোমেন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম বন্দরে সমাপনী সমাবেশ

চট্টগ্রাম জেলা সিপিবি'র সভাপতি অশোক সাহার সভাপতিত্বে এবং বাসদের জেলা ইনচার্জ আল-কাদেরী জয়ের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন, কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ, মাসুদ রানা, মোশররফা মিশু, নাসিরউদ্দিন আহম্মদ নাসু, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মাসুদ খান, মহিনউদ্দীন চৌধুরী লিটন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাউঁ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের সমন্বয়ক দিলীপ রায়, গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের সমন্বয়ক মফিজুর রহমান লাল্টু, ভাসানী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. হারুনুর রশীদ, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

বন্দর পরিচালনা কেন গুরুত্বপূর্ণ

কোনো দেশের সম্পদের উপর মালিকানা কার হাতে থাকবে সারা পৃথিবীতেই এটা এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সম্পদ-তা মাটির নিচের, মাটির উপরের বা প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসৃষ্ট সম্পদ এমনকি মানব সম্পদ তা যাই হোক না কেন। এর মধ্যে কিছু সম্পদ আছে তার মূল্য টাকার পরিমাণে নির্ধারণ করা যায় না। যে কোন দেশের জন্য তা অপরিসীম গুরুত্ব

বহন করে। সমুদ্র বন্দর তেমনি জনগণের এক সম্পদ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদগুলোর একটি হলো বন্দর। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বেশির ভাগ পরিচালিত হয় এই বন্দরের মাধ্যমে। দেশের মাটির নিচের গ্যাস, কয়লা, খনিজসম্পদ ফুরিয়ে যাবে কিন্তু আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হবে না। এই আমদানি-রপ্তানির প্রধান বন্দর, চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) দুবাইভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের (দুবাই পোর্ট ওয়ার্ল্ড) কাছে ইজারা দেওয়ার এক সর্বনাশা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে সরকার। সরকার বলছে, ডিপি ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর অনেক দেশের বন্দর পরিচালনার কাজ করছে; তারা আন্তর্জাতিক মানের বন্দর পরিচালনায় দক্ষ। ডিপি ওয়ার্ল্ডের মতো অভিজ্ঞ কোম্পানির মাধ্যমে বন্দর আধুনিকায়ন ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার হবে। এর মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে এবং বন্দরের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বাড়বে।

বাস্তবে দেশ-বিদেশের উদাহরণ কী বলে? কোন দেশের সমুদ্রবন্দর ইজারা কেবল অর্থনীতির বিষয় নয়; এটি একটি কৌশলগত বিষয়। এর



ফলে জাতীয় সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিদেশি কোনো কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে কিনা, এই বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের প্রবেশ মুখে বিদেশি কোম্পানি

বিদেশি কোম্পানিকে বন্দর কিংবা বন্দরের কোন টার্মিনাল ইজারা দিলে তাঁরা পরিচালনা, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এবং প্রবেশাধিকারসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। দেশ যদি দুর্বল হয় আর বিদেশি কোম্পানি যদি সবল হয় তাহলে জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিদেশি কর্তৃত্বের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে; ভবিষ্যতে বন্দর নিয়ে জটিলতা ও বিরোধ তৈরি হতে পারে, এমনকি জাতীয় নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়তে পারে। ফলে, আশঙ্কা করা স্বাভাবিক এবং প্রশ্ন তোলাও যৌক্তিক যে, চট্টগ্রাম বন্দরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার পরিচালনা বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া দেশের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ।

বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত, একদিকে সমুদ্র। যে দেশের সীমানায় সমুদ্র নেই সেই দেশ খুবই অভাগা। কিন্তু সমুদ্র থেকেও যদি তার নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে সে দেশকে বলা হবে দুর্ভাগা। পৃথিবীতে এমন দেশের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। ফলে সমুদ্র-বন্দর এবং তার ব্যবহার একটা দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের কথা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেশের আমদানি ও রপ্তানির প্রধান গেটওয়ে চট্টগ্রাম বন্দর। দেশের মোট আমদানি রপ্তানির ৮০ শতাংশের বেশি হয় এই বন্দর দিয়ে। আর এই বন্দরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিউ মুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল। দেশের মোট পণ্য ওঠানামার ৫৫ শতাংশই হয় এটি দিয়ে। পণ্য ওঠানামার আধুনিক সব উপকরণ রয়েছে এই

টার্মিনালে। এ থেকে বছরে হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আয় করে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

ফলে, চট্টগ্রাম শুধু একটি বন্দরই নয়, এটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই টার্মিনাল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদ হয়েছিল তখনও। বিগত সরকারের পরিকল্পনাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এগিয়ে নিচ্ছে। বলা হচ্ছে, বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম টার্মিনাল অপারেটর সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ডকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) মাধ্যমে জি-টু-জি ভিত্তিতে টার্মিনালটি পরিচালনার ভার দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এটা শেষ নয়, এর আগে তারা সৌদি কোম্পানি রেড সি গেটওয়ে ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডকে (আরএসজেটিআই) দেওয়া হয়েছে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিটিসি)। তারা অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করেছে। এই টার্মিনালে আমদানি পণ্য নিয়ে ভিড়তে শুরু করেছে বিদেশি জাহাজ। চট্টগ্রাম বন্দরের বে-টার্মিনাল এবং লালদিয়ার চরও

পরিকল্পনা করে আওয়ামী লীগ সরকার। তার বিরুদ্ধে বামপন্থি দলসমূহ, চট্টগ্রাম বন্দরের ২২টি শ্রমিক সংগঠন, তেল-গ্যাস বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। দাবি উঠেছিল বন্দরের মতো স্পর্শকাতর স্থাপনা বিদেশিদের হাতে তুলে দিলে তা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। বিশেষত, এ দেশে একটিই মাত্র সমুদ্র বন্দর সেই দেশের জন্য। আন্দোলনের মুখে এবং আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণে ভুয়া বলে চিহ্নিত হওয়ার পর সে সিদ্ধান্ত বাতিল হয়।

তখন বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ২০০১ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ শুরু হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তহবিল থেকে ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে টার্মিনাল নির্মাণ করে। এখন বন্দরের মূল আয়ের ৬০ ভাগ আসে এখান থেকে। টার্মিনালের জন্য ২ হাজার কোটি টাকার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। সে কারণে টার্মিনালের উৎপাদনশীলতা অনেকগুণ বেড়েছে। যার ফলে, ২০০৭ থেকে '২৪ সাল পর্যন্ত এই একটি টার্মিনালেই ১ কোটি ১৮ লাখ ৬৩ হাজার টিইইউএস (২০ ফুট সমমানের) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা গেছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের মতে এই টার্মিনালে বর্তমানে যে পরিমাণ ইকুইপমেন্ট আছে তা দিয়ে আগামী ১৫ বছর বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। নিউ মুরিং টার্মিনালের প্রতি বিদেশি নজর এবং আমাদের উদ্বেগের মূল কারণ হলো, এটি চট্টগ্রাম বন্দরের চারটি টার্মিনালের মধ্যে সবচেয়ে বড়, এতে এক সাথে চারটি সমুদ্রগামী জাহাজ ভিড়তে পারে। টার্মিনালে স্বয়ংক্রিয় ক্রেন থাকায় দ্রুতগতিতে কন্টেইনার ওঠানো ও নামানো যায়। বন্দরের হিসাবে, গত বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে তিন লাখ বেশি কন্টেইনার ওঠানো হয়েছে এই টার্মিনালে।

দেশের টাকায় তৈরি টার্মিনাল

বিদেশিদের ব্যবস্থাপনায় দেবো কেন?

বলা হচ্ছে বন্দর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অভিজ্ঞ ও দক্ষ বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া এখন বৈশ্বিক প্রবণতা। পৃথিবীর অনেক দেশেই বিদেশি বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় বন্দর পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে যা বলা হয় না, তাহলো কোনো বন্দরে বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে আনা হয় দুটো কারণে।

প্রথমত, নিজেদের পুঁজি না থাকায় বিনিয়োগ পাওয়া, দ্বিতীয়ত, উন্নত যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ কর্মীর সাথে থেকে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি। কিন্তু নিউমুরিং টার্মিনালে নতুন করে এসব খাতে বিনিয়োগের সুযোগ যেমন নেই, তেমনি পাশেই নৌঘাটি থাকায় এটি সম্প্রসারণেরও সুযোগ নেই। প্রশ্ন উঠে, তাহলে কেন এত উৎসাহ?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দেয়া হয়ে থাকে যে, অনেক দেশে বিদেশি বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় বন্দর পরিচালিত হয়। কিন্তু সেসব দেশগুলোতে বন্দরের সংখ্যা কত? তারা কী পরিমাণ উন্নত সেবা পায় তারও তুলনামূলক আলোচনা করা দরকার। যেমন, ভিয়েতনামে ২৯৬টি বন্দর আছে। তার মধ্যে হাইফং, কাই মেপ-থি ভাই এবং সাইগন বিশ্বের শীর্ষ ৫০টি কন্টেইনার বন্দরের অন্যতম। শ্রীলঙ্কায় ৮টি বন্দর, পাকিস্তানে ৩৭টি বন্দর যার মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর, ভারতে ২৩০টি বন্দর যার মধ্যে ১২টি প্রধান বন্দর যেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়। ভারতের এই বন্দরগুলোর মাধ্যমে সে দেশের ৯৫ শতাংশ আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ কি এইসব দেশের মতো? যে দেশের শিল্পের কাঁচামাল পুরোটাই আমদানি নির্ভর, জালানির উপর বিদেশি নির্ভরতা অনেক বেশি, রপ্তানির ৮০ শতাংশ গার্মেন্টস পণ্য, খাদ্য এবং ভোজ্য তেল আমদানি করতে হয় সেই দেশ তার একমাত্র বন্দরের

এর পর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে।

কথার ফানুস এবং বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা

প্রেসসচিব বলেছেন, এর ফলে তরুণদের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে। বাংলাদেশ ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হলে শুধু দেশের ১৮ কোটি মানুষের জন্য নয়; পুরো রিজিওনের ৩০-৪০ কোটি লোক এর সুফল ভোগ করবে! চট্টগ্রামের লালদিয়া, বে-টার্মিনাল, পতেঙ্গা টার্মিনাল, মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দরসহ পুরো অঞ্চলটাই বন্দরের উপযোগী।

চট্টগ্রাম বন্দর ও আশেপাশের টার্মিনালগুলোর সক্ষমতা ১ দশমিক ২৭ মিলিয়ন টিইইউএস (২০ ফুট দীর্ঘ) কনটেইনার। সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে এই সক্ষমতা ৭৮ লাখ ৬০ হাজার টিইইউএস-এ উন্নিত করা। অর্থাৎ ছয় গুণ বাড়ানো। বাংলাদেশকে ইকোনমিক হাব, ম্যানুফ্যাকচারিং হাব করতে হলে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিই হচ্ছে প্রধান পূর্বশর্ত। কথাগুলো শুনতে ভালো কিন্তু শুধু বন্দরের সক্ষমতাই কী আসল? দেশের প্রয়োজন কত, রাস্তার ধারণ ক্ষমতা, কন্টেইনার রাখার ক্ষমতা, আমদানি-রপ্তানি কত বাড়তে পারে, আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী, ভারতের পণ্য পরিবহনের সুযোগ এবং শঙ্কা কী? এগুলো হিসাব না করে শুধু সম্ভাবনা কথার ফানুসে পরিণত হবে।

অতীতের ষড়যন্ত্র এবং

চট্টগ্রামসহ সারাদেশের মানুষের লড়াই

একটু অতীতের দিকে চোখ ফেরানো যাক! ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দর স্টিভেডর সার্ভিসেস অফ আমেরিকা (এসএসএ) নামের একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানকে ১৯৮ বছরের জন্য লিজ দেয়ার

বৈদ্যুতিক থ্রি হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা '২৫ এ ইজিবাইক, ব্যাটারি রিকশা অন্তর্ভুক্ত কর

BRTA কর্তৃক সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন, সারাদেশে থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় যানবাহনের নিবন্ধন-রুট পারমিট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও প্রশিক্ষণ প্রদানের দাবি

ব্যাটারিচালিত যানবাহন
ইজিবাইক ও রিকশা চালকদের
কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত

◆ বৈদ্যুতিক থ্রি হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫-এ ইজিবাইক, ব্যাটারি রিকশা অন্তর্ভুক্ত করা, ◆ BRTA কর্তৃক অভিন্ন ও সমন্বিত নীতিমালার আলোকে ঢাকাসহ সারাদেশে থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় যানবাহনের নিবন্ধন, ◆ রুট পারমিট, চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও প্রশিক্ষণ প্রদান করার দাবিতে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৩ জুলাই '২৫ ঢাকা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের আহ্বায়ক খালেদুজ্জামান লিপনের সভাপতিত্বে ও সদস্য আবু জাফরের সঞ্চালনায়, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, শ্রম সংস্কারবিষয়ক কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতানউদ্দিন আহমেদ, রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী সংগ্রাম পরিষদের নেতা জনার্দন দত্ত নান্দু, আশরাফ হোসেন, রাহাত আহমেদ, কিবরিয়া হোসেন, কোহিনুর আক্তার কনা। সমাবেশের পূর্বে সংগঠনের একটি বিশাল মিছিল মতিঝিল, দৈনিক বাংলা, পল্টন মোড়, জাতীয় প্রেসক্লাব, দোয়েল চত্বর হয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশ শেষে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপির বক্তব্য

জুলাই গণ অভ্যুত্থানের মাসে সারাদেশের ৫০ লাখ ব্যাটারিচালিত রিকশা, ইজিবাইক ও সমজাতীয় যানবাহনের চালকদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। রিকশা বাংলাদেশের একই সাথে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং সবচেয়ে অবহেলার বাহন। আপনি জানেন রিকশা চালানো কত অমানবিক পরিশ্রমের কাজ। প্রচণ্ড দাবদাহ, প্রবল বৃষ্টি কিংবা তীব্র শীতেও নিজের জীবিকা ও যাত্রীর সুবিধার কথা ভেবে দিনে-রাত্রে রিকশাচালকরা রাস্তায় রিকশা চালিয়ে থাকে। এই বাহনের চালকদের শারীরিক পরিশ্রম লাঘব করা, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য আর খরচ কমানোর কথা বিবেচনা করে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে রিকশায় ব্যাটারি স্থাপন করা শুরু হয়। প্রথমদিকে নির্মাণজনিত কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও ইতিমধ্যে তার অনেকাংশই দূর করে স্থানীয়ভাবেই আধুনিকায়ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া এই বাহন যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তেমনি সহজ, সস্তা এবং শহরের অলিগলিতে চলতে পারে বলে স্বল্প আয়ের মানুষের দৈনন্দিন কাজে এক অপরিহার্য বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

আপনি জানেন, সারা দেশে প্রায় ৫০ লাখ চালক পরিবার এইসব ব্যাটারি চালিত থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় যানবাহনের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। শুধু রিকশা চালানোই নয়, এইসব যানবাহন তৈরি-মেরামত, খুচরা যন্ত্রাংশ নির্মাণ, বিক্রি, ব্যাটারি উৎপাদন ও বিপণন, চার্জিংসহ নানা ধরনের কাজে অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল। যেহেতু দেশের সকল জেলা ও বিভাগে নগর পরিবহণ নেই ফলে কোটি কোটি মানুষ ব্যাটারি চালিত যানবাহন



ব্যবহার করে থাকে। এই খাত একদিকে যেমন বিপুল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে অন্যদিকে তেমনি দেশের অর্থনীতিতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এইসব বাহন বিদ্যুতে চলে বলে পরিবেশ দূষণ কম করে। এইসব বাহন বিদ্যুৎ শাস্রীয়, চালকেরা বিদ্যুৎ চুরি করে না বরং বর্ধিত দামে (প্রায় ২৫ টাকা ইউনিট) বিদ্যুৎ কিনে থাকে। তাই কর্মসংস্থান, জীবিকা, যাতায়াত এবং দেশের অর্থনীতির বিকাশের কথা বিবেচনা করলে এই খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান এবং প্রয়োজনীয় এই খাতের জন্য এখন প্রয়োজন সঠিক নীতিমালা এবং ব্যবস্থাপনা। আমরা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বিগত প্রায় ১২ বছর যাবৎ একটি নীতিমালার ভিত্তিতে বিআরটিএর অধীনে ঢাকাসহ সারাদেশে উক্ত যানবাহনের নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স, রুট পারমিট প্রদান, সড়ক মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন/সার্ভিস রোড নির্মাণসহ ৮ দফা দাবি জানিয়ে আসছি। ইতিমধ্যে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্ত ও থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সূচ্য ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২৪ চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। আমরা জানতে পেরেছি ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য বিআরটিএ-র অধীনে নতুন করে বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫ নামে একটি নীতিমালা চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বুয়েট কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইনে তৈরি ব্যাটারি রিকশা ঢাকা মহানগরের ৩টি থানায় আগামী আগস্ট মাস থেকে চালু হবে। কিন্তু নীতিমালা প্রণয়ন না করে এসব উদ্যোগের ফলে একটি বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে আমাদের আশঙ্কা।

ছাত্র-শ্রমিক, জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশে এক নতুন সভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। অভ্যুত্থানে রিকশা শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও জীবনদানের কথা দেশবাসী জানে। এই নতুন পরিস্থিতিতে আপনার নেতৃত্বে এই খাতের উন্নতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে তা

আমরা প্রত্যাশা করি। আমরা প্রত্যাশা করি ব্যাটারিচালিত যানবাহনের ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন ও সমন্বিত নীতিমালা চূড়ান্ত হবে, যার মাধ্যমে বিআরটিএ অধীনে ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশে এই বাহনগুলো চলবে। আমাদের আশা, স্বল্প পুঁজির এবং স্বল্প আয়ের মানুষের জীবন-জীবিকা ও গণপরিবহনের কথা বিবেচনা করে আমাদের প্রস্তাবগুলো আপনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

১. বৈদ্যুতিক থ্রি হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৫-এ ইজিবাইক, ব্যাটারি রিকশা অন্তর্ভুক্ত করা, BRTA কর্তৃক অভিন্ন ও সমন্বিত নীতিমালার আলোকে ঢাকাসহ সারাদেশে থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় যানবাহনের নিবন্ধন, রুট পারমিট, চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা। নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ করা।

২. ব্যাটারিচালিত/ইলেকট্রিক যানবাহন উৎপাদন, বিপণন যেন সিডিকেটের নিয়ন্ত্রণে না যায়। স্থানীয় উৎপাদকদেরকে বিআরটিএ অনুমোদিত ব্যাটারিচালিত যানবাহন উৎপাদন ও বিপণনের অনুমতি প্রদান এবং স্থানীয় মেকানিকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩. ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বৈধ ঘোষিত ব্যাটারিচালিত যানবাহন উচ্ছেদ-জব্দ, রিকশা ধ্বংস, চালক-গ্যারেজ মালিকদের হয়রানি ও বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা বন্ধ করা। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ববৃন্দের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা।

৪. কারিগরি ত্রুটি সংশোধন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের আধুনিকায়ন করা। চালক-মেকানিক, মালিকসহ ৬০ লাখ ও তাদের উপর নির্ভরশীল ২.৫/৩ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচল বন্ধের কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া।

৫. ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভ্যুত্থানে ব্যাটারিচালিত রিকশা, ইজিবাইকের চালকসহ নিহত-আহত সকল শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পূর্ববাসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. দেশের ও মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য পার্কিং ও চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা।

পরিবেশবান্ধব লিথিয়াম ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের জন্য সরকারি ভর্তুকি প্রদান করা।

৭. দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ও সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রতিটি সড়ক মহাসড়কে স্বল্পগতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য পৃথক লেন/সার্ভিস রোড নির্মাণ ও চালকসহ সংশ্লিষ্টদের ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৮. ব্যাটারিচালিত যানবাহনের কাছ থেকে অবৈধ চাঁদা আদায়, বিট বাণিজ্য, ব্যাটারি ছিনতাই-চুরি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও নারী চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সকল শ্রমিকের জন্য আর্মি রেটে রেশন, পেনশন, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

মাননীয় উপদেষ্টা,

আপনি জানেন বিগত আন্দোলনে শ্রমজীবীরা কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো। তাদের প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হোক, যাতে তারা শান্তিতে জীবন নির্বাহ করতে পারে। এই আশায় তারা রাস্তায় নেমে এসেছিলো। ২৪-র ছাত্র-শ্রমিক, জনতার অভ্যুত্থানে কমপক্ষে ২৪ জন রিকশা শ্রমিক জীবন দিয়েছে। অসংখ্য শ্রমিক আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করেছে। তাদের প্রতি দায় আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বেকারত্বের এই দেশে ব্যাটারি চালিত যানবাহনের চালকরা নিজেরা নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছে, এর ফলে যাত্রীরা সহজে ও সস্তায় চলাফেরা করার বাহন পেয়েছে, এখন প্রয়োজন সরকারি নীতি সহায়তা। আমরা মনে করি এই সময়ে সরকার উদ্যোগ নিলে এই খাতের সংকট দূর হবে এবং জন ও পরিবেশবান্ধব বাহনের সুফল জনগণ পাবে। তাই সারাদেশের ৫০ লাখ চালক ও তাদের উপর নির্ভরশীল কোটি কোটি মানুষ আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের জীবিকা ও জীবনমান উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা এবং কার্যকর পদক্ষেপগ্রহণে আপনার সহৃদয় ভূমিকা আমরা প্রত্যাশা করি।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, বাংলাদেশে বেকার সংকট ভয়াবহ, কাজ নাই, নিয়োগ বন্ধ। বিগত সরকারগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কলকারখানা বন্ধ করে দিয়েছে, নতুন কারখানা তৈরি করেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে শুধুমাত্র গাজীপুর-সাভার, নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী ও বাগেরহাটেই কমপক্ষে ১০৮টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। এখন যারা স্বকর্মে নিয়োজিত তাদের ওপর আক্রমণ-নিপীড়ন নেমে এসেছে আপনারা এর প্রতিবাদে এখানে সমবেত হয়েছেন। এর প্রতিবাদ করতে গেলে বাসদ ও শ্রমিক ফ্রন্টের সদস্য চট্টগ্রামে আল-কাদেরী জয়, মিরাজ উদ্দীন, রোকন, বরিশালে ডা. মনীষা, রমনদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, নেতাকর্মীরা নির্যাতন-নিপীড়ন হয়রানির শিকার হয়েছে। আমরা এক যুগ আগে বরিশালে এই আন্দোলনের সূচনা করি।

প্রতি বছর দেশে ২০ থেকে ২২ লাখ মানুষ শ্রমের বাজারে আসে। সরকারি-বেসরকারি মিলে ৫-৬ লাখ মানুষ কাজ পায়। বাকি মানুষ কোথায় যাবে, কীভাবে খাবে? পৃথিবীর অনেক দেশে বেকারদের ভাতা দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও যারা কাজ পাবে না, তাদের বেকার ভাতা দিতে হবে। মানুষ যে সমস্যা সমাধানের জন্য অভ্যুত্থান করেছে, সে সমস্যার কী সমাধান হয়েছে? হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ড. ইউনুস ও শূন্য তত্ত্ব প্রচার করছেন। অর্থাৎ, তিনি—দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও পরিবেশ দূষণ (কার্বন নিঃসরণ) শূন্যতে নামিয়ে আনবেন। বিগত সরকার দেশে যে সকল এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বন্দর পরিচালনা করতে হবে।। মানবিক করিডোর দেওয়া চলবে না

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

ঝুঁকি নিতে পারে কি? পাশাপাশি এই অঞ্চলের বাণিজ্যের কথা ভাবলে ভূ-রাজনৈতিক, সামরিক বিষয়টাও গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, দিনে দিনের বিয়টি আরও জটিল পর্যায়ে যাচ্ছে। ফলে লাডের আশায় একমাত্র বন্দরকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি ও ঝুঁকিতে পড়বে কিনা তা গভীরভাবে ভাবা দরকার।

বন্দরের সক্ষমতা, আমাদের দক্ষতা কম, তাই বিদেশিদের দাও-এ হলো পুরনো কৌশল

সক্ষমতা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। সেসব কিছু বিবেচনায় না নিয়ে বিদেশিদের কাছে তুলে দেওয়া উদ্দেশ্য প্রণোদিত। চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দ্বিমত নেই। এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ব্যস্ত বন্দর হলেও এর দক্ষতা আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে একটি জাহাজ বার্ষিক্যের (জাহাজের অপেক্ষার সময়) জন্য চট্টগ্রামে তিন-চর দিন অপেক্ষা করতে হয়, সেখানে সিঙ্গাপুরে ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা এবং কলম্বোয় ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন হয়। একইভাবে কনটেইনার খালাসে চট্টগ্রাম বন্দরে ৭ থেকে ১০ দিন সময় লাগে, যা বিশ্বের শীর্ষ বন্দরে সাধারণত ২-৩ দিনের মধ্যে শেষ হয়। এর ফলে রপ্তানি ও আমদানির খরচ বেড়ে যায়। কিন্তু একথা ভাবতে হবে, বন্দরের কর্মদক্ষতা কেবল অপারেশন ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে না, ভৌগোলিক অবস্থান ও কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার ওপরও নির্ভর করে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক নদীর তীরে একটি সরু চ্যানেলে অবস্থিত, যেখানে পানির গভীরতা (ড্রাফট) প্রায় ৯ দশমিক ৫ মিটার যা আবার জোয়ার-ভাটার কারণে কম-বেশি হয়। ফলে চাইলেই বড় জাহাজ এখানে ভিড়তে পারে না। পানির অগভীরতার পাশাপাশি কর্তৃক নদীর সরু চ্যানেল, তীক্ষ্ণ বাঁক ও জোয়ার-ভাটার পরিবর্তন জাহাজ চলাচলে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে জাহাজের ‘টার্ন-অ্যারাইভ টাইম’ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এই সীমাবদ্ধতার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সিঙ্গাপুর বা কলম্বো বন্দর তুলনা করা অযৌক্তিক।

আবার অন্যান্য দুর্বলতাও আছে। আধুনিক স্ক্যানিং প্রযুক্তি ও ডিজিটাল সিস্টেমের অভাবে চট্টগ্রাম বন্দরে কাস্টমস ক্রিয়ারে ৭ থেকে ১০ দিন সময় লাগে। অবকাঠামো ও গুদাম ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা পণ্য হস্তান্তরে বিলম্ব ঘটায় আর শ্রমিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই চট্টগ্রাম বন্দরের চ্যালেঞ্জ কেবল কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়েই সীমাবদ্ধ নয়, এর কার্যকর সমাধানে প্রয়োজন কাস্টমস-প্রক্রিয়ার দ্রুততর ডিজিটাইজেশন, শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং গুদামজাতকরণ ও পরিবহনব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। এসব দুর্বলতা দূর না করে সব দায় কনটেইনার হ্যান্ডলিং এর উপর চাপানো এবং বিদেশিদেরকে দেয়ার ওকালতি করা দুরভিসন্ধিমূলক।

বহুজাতিক কোম্পানি

বন্ধুবেশে ঢুকে, ছুরি মারে বুকে

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, আইএফসি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর নীতি-স্বাধীন দাও, অসহায় করে রাখা এবং লুণ্ঠন কর। এই দর্শন। তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগের নামে কৌশলগত খাতগুলোতে বেসরকারিকরণে উৎসাহ দিচ্ছে, এবং জাতীয় স্বার্থ ধ্বংস করছে। এর অনেক উদাহরণ আছে। এ ধরনের চুক্তি কত ঝুঁকিপূর্ণ একটি উদাহরণ দেখি। যেমন, আফ্রিকার ছোট দেশ জিবুতি ২০০৬ সালে দুবাইভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ‘ডোরালে কনটেইনার টার্মিনাল’ পরিচালনার জন্য ৫০ বছরের জন্য ইজারা দিয়েছিল। শুরুতে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের

প্রতিশ্রুতি থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়। ফলে ২০১৮ সালে জিবুতি সরকার একতরফাভাবে চুক্তি বাতিল করে। জবাবে ডিপি ওয়ার্ল্ড আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি সংস্থায় মামলা করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দাবি করে জয়লাভও করে। এ ধরনের উদাহরণ শুধু আফ্রিকায় নয়, দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোতেও দেখা গেছে। যেমন, ২০১৪ সালে কেনিয়ার মোম্বাসা বন্দরের একটি টার্মিনাল চীনা কোম্পানি সিমারবিসিকে দিয়েছিল। শুরুতে রাজস্ব বাড়লেও পরে স্থানীয় শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা আর কাজ করতে পারছিল না। কারণ, চীনা কোম্পানিগুলো নিজস্ব শ্রমিক সরবরাহ, ঠিকাদার ও সরবরাহব্যবস্থা ব্যবহার করেছিল।

বিশ্বব্যাংকের ২০২০ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেসব অবকাঠামো প্রকল্পে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) বা বেসরকারিকরণ বাস্তবায়িত হয়েছে, সেগুলোর ৪২ শতাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকি ও দায় শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকেই বহন করতে হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন ও কেনিয়ার মতো দেশের অভিজ্ঞতা বলছে, বিদেশি কোম্পানিকে কৌশলগত খাতের নিয়ন্ত্রণ দিলে স্থানীয়দের ক্ষমতা দুর্বল হয় এবং স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা কমে যায়। বিশ্বব্যাপী এটা



প্রমাণিত যে, কৌশলগত খাতে বেসরকারিকরণ টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি; বরং আয়বৈষম্য, শ্রমবাজার সংকোচন এবং সামাজিক অসন্তোষ বেড়েছে। ওইসিডির ২০২২ সালের এক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, যথাযথ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছাড়া কৌশলগত সম্পদের বেসরকারিকরণ দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ও দরকষাকষির ক্ষমতা দুর্বল করে।

বিদেশি মানেই দক্ষ নয়, এর প্রমাণ ভূরিভুরি

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, দক্ষতা বাড়ানোর একমাত্র উপায় কি বিদেশি কোম্পানির হাতে বন্দর ব্যবস্থাপনা তুলে দেওয়া? ২০২৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের পাশেই নবনির্মিত পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল একটি সৌদি কোম্পানির অধীন পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী বার্ষিক পাঁচ লাখ টিইইউ হ্যান্ডল করার কথা থাকলেও এক বছর পর লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১৩ শতাংশ অর্জন করেছে তাঁরা। সেখানে এখনও পর্যাপ্ত গ্যাক্সি ক্রেন বসানো হয়নি এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল ও টার্মিনাল অটোমেশন গড়ে তোলা হয়নি। ফলে, ২০২৩ সালে সৌদি অপারেটরের সঙ্গে করা চুক্তিটি জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে, শুধু বিদেশি অপারেটর আনলেই দক্ষতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত হয় না। অবকাঠামো, জনবল ও সুশাসনের ঘাটতি থাকলে তারাও ব্যর্থ হয়। একই অভিজ্ঞতা আফ্রিকার মোম্বাসা ও লাতিন আমেরিকার গুয়ায়াকিল বন্দরে দেখা গেছে; যেখানে বিদেশি পরিচালনা সেবার মান বাড়াতে পারেনি।

জনগণকে জানাতে এত ভয় কেন?

এনসিটি পরিচালনা বিষয়ে দুবাইভিত্তিক কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ইজারার শর্তাবলি এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। এর ফলে চুক্তির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব, অর্থনৈতিক লাভ-

ক্ষতি কিংবা কৌশলগত ঝুঁকি সম্পর্কে স্বচ্ছ ও বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন করা দুরূহ। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বলছে, বিদেশি অপারেটর নিয়োগে বন্দরের দক্ষতা বাড়লেও কনটেইনার চার্জ বৃদ্ধি, শ্রমিক অধিকার সংকোচন, কৌশলগত তথ্যঝুঁকি এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের আশঙ্কা বাড়়ে। বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণা অনুযায়ী, বেসরকারিকরণে বন্দর পরিচালনার ব্যয় ২০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। ভারতের অভিজ্ঞতায়ও দেখা গেছে, বিদেশি অপারেটরের নিয়ন্ত্রণে বন্দরের পরিচালনা সরাসরি স্থানীয় অর্থনীতিকে চাপের মুখে ফেলে। ভারতের মুদ্রা ও শ্রীলঙ্কার হামবানটোটা বন্দরে বিদেশি অপারেশনের অধীন কনটেইনার চার্জ ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ব্যবসায়িক ব্যয় ও প্রতিযোগিতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে আর এই প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিসর্য। তবে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সমাধান শুধু বিদেশি অপারেটরের ওপর নির্ভর করে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি সুসমন্বিত বহুমাত্রিক রোডম্যাপ; যেখানে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন এবং নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক

সংস্কার একসঙ্গে পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কাস্টমস প্রক্রিয়া, অপারেশনাল ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক ব্যবস্থাপনা এবং পণ্য পরিবহন ও গুদামজাতকরণসহ সমগ্র লজিস্টিকস শৃঙ্খলকে আধুনিক ও কার্যকর করতে হবে একটি সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে জনগণের পক্ষের শক্তির নজরদারি বাড়ানো দরকার।

দেশের হৃদপিণ্ডে বিদেশিদের থাবা

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূস বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের হৃদপিণ্ড। কথাটা ঠিক। শরীরের রক্ত প্রবাহের মতো অর্থনীতি হলো দেশের রক্ত প্রবাহ। হৃৎপিণ্ড সবল না হলে যেমন শরীরের রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়, তেমনি এই বন্দর দুর্বল হলে দেশের অর্থনীতির কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটবে আর যদি হৃদপিণ্ডে বিপদের থাবা পড়ে বিদেশিদের তাহলে অর্থনৈতিকভাবে জিম্মি হয়ে পড়বে দেশ। হৃৎপিণ্ডকে শুধু সবল করা নয় অন্যের দখল থেকে রক্ষা করাও দরকার। সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বন্দর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কেবল অর্থনৈতিক নয়, কৌশলগত এবং এর সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা জড়িত। আগামী দিনের সম্ভাবনার বিষয়টিও জড়িত। বন্দর রক্ষার আন্দোলন তাই দেশ ও ভবিষ্যৎ রক্ষার আন্দোলন।

মানবিক করিডোরের নামে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়ানোর তৎপরতা বন্ধ কর

দীর্ঘদিন ধরে ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী জন্মভূমি, বাসস্থান-জমি, সহায়সম্মল হারিয়ে শুধুমাত্র জীবনটা নিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় শিবিরে

দিন নয়, মাস নয়, বছর কাটাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী অনেক আহা-উহু হয়েছে কিন্তু তাদেরকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি কোনো দেশ এমনকি দেশসমূহের সংস্থা জাতিসংঘ। অমানবিক জীবন কাকে বলে তা উদ্বাস্তুদের না দেখলে বুঝা যায় না। দেশ থেকে বিতাড়িত, যেখানে আশ্রয় নেয় সেখানে পদে পদে লাঞ্ছনা আর নিষেধের বেড়াজাল। সাহায্যের উপর নির্ভর করে দিন চলে, ভবিষ্যৎ বলতে অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু অতীত। এর মাঝেই অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্তান জন্ম নেয়। ফলে, বেঁচে থাকার জন্যেই জড়িয়ে পড়ে অপরাধের অন্ধকার জগতে। এদের সব দায় এখন বাংলাদেশের-যে দেশ নিজেই নানা সমস্যায় জর্জরিত। এটি এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ শরণার্থীশিবির। বিশ্বের মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ এবং রাষ্ট্রগুলোও এখন বিরক্ত। সহায়তার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। বিদেশি সাহায্য কমছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই বোঝা আরও বড় হচ্ছে। বাংলাদেশ একা পারবে না। এদের জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা খুব দরকার।

জাতিসংঘ মহাসচিব এলেন বাংলাদেশে

মিয়ানমারের সামরিক জাভা সরকারের বাহিনীর সঙ্গে ২০২১ সাল থেকে বিদ্রোহীদের গৃহযুদ্ধ চলছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন রাখাইন রাজ্য নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে সশস্ত্র আরাকান আর্মি। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি গত বছরের নভেম্বরে রাখাইন রাজ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে-তাতে মিয়ানমারে দুর্ভিক্ষ আসন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এমন প্রেক্ষাপটে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ সফরে আসেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। দেশের জনগণ দেখলেন, তিনি ক্যাম্প পরিদর্শন করছেন, ইফতার করছেন এক সাথে। শোনা গেল, রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে পাঠানোর নাকি ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, আগামী ঈদ নাকি তাঁরা নিজেদের বাড়িতেই করবেন। উপদেষ্টার হাসিমুখ দেখে সবাই খুশি। কিন্তু ব্যাপার ঘটলো উলটো! রোহিঙ্গারা নিজ বাড়িতে ফিরে যাবেন কি, আরও সোয়া লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো বাংলাদেশে। জাতিসংঘ মহাসচিব তখন ফিরে গেছেন নিজ কার্যালয়ে।

অকস্মাৎ এলো করিডোর প্রসঙ্গ

এমন সময় প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা বিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান মানবিক সহায়তা চ্যানেলের প্রসঙ্গ আলোচনায় নিয়ে এলেন। তার পর ২৭ এপ্রিল পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘মানবিক প্যাসেজ’ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার ‘নীতিগত সিদ্ধান্ত’ নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘আমি এটুকু আপনাদেরকে বলতে পারি, নীতিগতভাবে আমরা এটাতে সম্মত। কারণ, মানবিক প্যাসেজ হবে।’ ‘কিন্তু এটাতে আমাদের কিছু শর্ত আছে, সেটার বিস্তারিততে যাচ্ছে না, সেই শর্তাবলি যদি পালিত হয়, আমরা এটাতে অবশ্যই সহযোগিতা করব, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবশ্যই।’ তার ওই বক্তব্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিতর্কের বাড় উঠলো যেন। চাইলাম রোহিঙ্গারা ফেরত যাবে আর পরিকল্পনা হচ্ছে মায়ানমারে অবস্থানরতদের জন্য করিডোর দেয়ার।

মানবিক করিডোর কী? কেনই বা প্রয়োজন হয়

সাধারণত, যুদ্ধবিক্ষণ্ড এলাকায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর যখন কোনো উপায় থাকে না, তখন একটি স্বীকৃত পথ বা প্যাসেজের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। তবে করিডোর মানেই যে জলভাগ বা স্থলভাগ হবে এমন নয় বরং এটি সময় নির্ধারণ করেও হতে পারে। সংঘাতময় এলাকায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর এমন পথ বা পদ্ধতিকেই **এর পর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১**

মবের নামে কী হচ্ছে?

ধনী-গরিবে বিভক্ত সমাজে গরিব মানুষের জীবনে কত সংকট! মধ্যবিত্তরা হাসফাস করে বাঁচে। তারপরও মানুষ একটু স্বস্তিতে থাকতে চায়। বেশির ভাগ মানুষ নিরুপদ্রব জীবনযাপন করতে চান কিন্তু পারে না। সমাজে বিরাজমান সংকটগুলোর কারণ সব হয়তো জানা নেই, এসবের সঙ্গে তিনি যুক্তও নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জীবনকে প্রভাবিত করে এমন অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় দেশের জনগণকে। দ্রব্যমূল্য স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনে সমস্যা, বেকারত্ব, চাকরি প্রার্থীদের সমস্যা, কৃষক-শ্রমিক, নারীর সমস্যা, সংখ্যালঘুদের সমস্যা এ রকম অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু যে সমস্যা সব মানুষকে প্রভাবিত করে, আতঙ্কিত করে তা হলো আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা। যার মুখোমুখি হচ্ছে দেশের মানুষ প্রতিদিন। এর নাম মব ভায়লেন্স বা মব সন্ত্রাস। দলবদ্ধ হয়ে একটা অজুহাতে হামলা করার প্রবণতা। এর পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এ ধরনের হামলার ঘটনা এখন প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অনেক সময় পুলিশের উপস্থিতিতেও ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে গত এক বছরে এ রকম ঘটনায় হামলা হয়েছে চিহ্নিত ব্যক্তির ওপর, কোনো অফিসে, চলেছে ঘরবাড়ি লুটপাট, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা, মাজার, আখড়া ভাঙার ঘটনাও ঘটেছে, বন্ধ হয়েছে নারীদের ফুটবল ম্যাচ। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে হামলা ও নির্যাতন হচ্ছে। কেউ কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এসব সমর্থন করছেন না। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে বলা হয়েছে, সরকার মব ভায়োলেেন্স সমর্থন করে না। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, মব ভায়োলেেন্স বন্ধ করতে হবে। বিএনপির নেতা বলেছেন, মব ভায়োলেেন্স মানবতার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা মব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। সভা-সমাবেশ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে বাম গণতান্ত্রিক জোটসহ রাজনৈতিক দলগুলো। মানবাধিকার সংগঠনগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে।

মব ভায়োলেেন্স চলছেই। এর কবলে পড়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, আহত-নিগৃহীত হচ্ছে। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) হিসাবে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম ৭ মাসে দেশে গণপিটুনির অন্তত ১১৪টি ঘটনা ঘটেছে। এতে ১১৯ জন নিহত ও ৭৪ জন আহত হয়েছেন। এসব দেখে আতঙ্কিত মানুষ প্রশ্ন, দেশে আইনের শাসন কোথায়? এই আক্রমণ ও হামলা থেকে মুক্তির উপায় কী? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যরাও জনগণের নিরাপত্তা দিচ্ছেন। আছে তাদের বিচারিক ক্ষমতাও। তারপরও সংঘবদ্ধ শক্তির আইন

হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা থামছে না। জনমনে স্বস্তি বা মানুষকে আশ্বস্ত করার দায়িত্ব যার কাঁধে তিনিও খুব ভালো বার্তা দিতে পারছেন না। ‘মব ভায়োলেেন্স’ (উচ্ছৃঙ্খল জনতার সংঘবদ্ধ আক্রমণ) বন্ধ করা যাচ্ছে না, তবে কমিয়ে আনা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে মবের ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার। ঘটনা যেখানেই ঘটুক না কেন, তার প্রভাব ছড়িয়ে পরে একেবারে ঘরের ভেতর পর্যন্ত। মব ভায়োলেেন্সের অসংখ্য ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ছে, যার অনেকই গা শিউরে ওঠার মতো। বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য বলছে, ১০ মাসে মবের শিকার হয়ে এবং গণপিটুনিতে সারা দেশে ১৭৪ জন মারা গেছেন।

এর মধ্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনার অন্যতম হলো, ২০ জুন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ এনে একদল লোক লালমনিরহাট শহরের একটি সেলুন থেকে পরেশ চন্দ্র শীল (৬৯) ও তার ছেলে বিষ্ণু চন্দ্র শীলকে (৩৫) মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এ ঘটনার একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এমনকি মবের শিকার হন দুই বিদেশি নাগরিক। গত মার্চ মাসে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের (ডলার বদলে টাকা নেওয়ার) সময় রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ইরানের দুই নাগরিককে মারধর করা হয়। ওই সময় তাদের ছিনতাইকারী আখ্যা দিয়ে ‘মব’ সৃষ্টি করা হয়। মারধরের একপর্যায়ে তাদের উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশও আহত হয়। যে পুলিশ অরাজকতা নিয়ন্ত্রণ করবে কিংবা নির্দোষকে রক্ষা করবে, সেই পুলিশও রেহাই পাচ্ছে না মব ভায়োলেেন্স থেকে। আসামি ছাড়িয়ে নেওয়া এবং বেআইনি দাবিতে থানা ও পুলিশের যানবাহন ঘেরাও করে হামলা হচ্ছে। পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র বলছে, ১০ মাসে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ৪৭৭টি মামলা হয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্টে পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে ৪১টি। আর সেপ্টেম্বরে ২৪, অক্টোবরে ৩৪, নভেম্বরে ৪৯ আর ডিসেম্বরে ৪৪টি। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৩৮, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭, মার্চে ৯৬, এপ্রিলে ৫২ এবং মে মাসে ৬২টি। হামলা বৃদ্ধির সংখ্যা উদ্বেগজনক। মব সন্ত্রাসের যেসব ঘটনা পত্রিকায় আসে, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ মব সন্ত্রাস পরিকল্পিত। শুধু হামলা নয়, ভিডিও করে প্রচার করা হচ্ছে। মব হলো অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো। জনবহুল রাস্তায় কয়েকজন মিলে কাউকে ধাওয়া দিলে, তার সঙ্গে না জেনেই জুটে যায় সাধারণ

মানুষ। ফলে এখনই একে দমন করা না গেলে, এই পরিস্থিতির শিকার যে কেউ হতে পারেন। এমন আতঙ্কজনক পরিস্থিতি কেন হলো তার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ অনুসন্ধান করা খুবই জরুরি। সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে যে, গত পনেরো বছরে রাজনৈতিক কর্তৃ ত্বের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের পুলিশ ও প্রশাসনের শৃঙ্খলা। এই প্রতিষ্ঠানগুলো যে রাষ্ট্রীয় এবং এখানে কর্মরতরা যে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী তা ভুলিয়ে দিয়ে দলীয় কর্মীর মতো ভূমিকা আর দুর্নীতির অবাধ সুযোগের কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলো দমন-পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সব নির্বাচনে এই দুই প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক সমাজের একটা বড় অংশকে এতটা অনৈতিক কাজে যুক্ত করা হয়েছিল, যার অতীত নজির নেই। প্রশাসনিক দায়িত্ব, সরকারের নির্দেশ মানতে গিয়ে মানবিক মূল্যবোধের যে অধঃপতন ঘটেছে, সেখান থেকে উত্তরণ না ঘটালে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা ফিরবে না। এ কথা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতেই হবে যে, যদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পালাবদল না হয়, তাহলে সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘাত রাজনৈতিক রূপ নেবেই। যদি গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন হয়, তাহলে যে সাময়িক শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা তৈরি হয়, সেই সময় এক ধরনের অরাজকতা চলে। আর এই সময়ে তাৎক্ষণিক সুবিধা নেওয়া, শত্রুতা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, জমি, বাড়ি, সম্পদ দখল করার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে। এসব যারা করে সেই মানুষগুলোর কোনো সামাজিক দায় নেই, থাকে না কোনো লজ্জা বা কোনো মানবিকবোধ। কাজেই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা, দখলবাজি বন্ধ করা, দেশকে আইনশৃঙ্খলার আওতায় নিয়ে আসার কাজটি প্রথম এবং প্রধান। দ্বিতীয় কাজটি হলো, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে বাজারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে অনিয়ন্ত্রিত বাজারের কারণে। চাহিদা-সরবরাহের সাধারণ নীতিকে পর্যুদস্ত করে বাজার সিভিকেট সরবরাহ চেইনে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সাধারণ মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। ফলে বাজার সিভিকেট ভেঙে দেওয়া এবং দ্রব্যমূল্য সহনীয় করে সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি আনা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

আর একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের চর্চা এবং জবাবদিহিতা না থাকায় গত পনেরো বছর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এমন দলীয়ভাবে কুক্ষিগত করা হয়েছিল, যা আগে কখনো হয়নি। এসব প্রতিষ্ঠান ভয়াবহ দুর্নীতি এবং দমনপীড়নের সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। যোগ্যরা বিতাড়িত

অথবা মাথা নিচু করে থেকেছে, আর দলীয় ব্যক্তিরা দুর্বিনীত হয়ে উঠেছিল। লুটপাট হয়েছে সীমাহীন। ফলে সব রকম সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষ আস্থা হারিয়েছে। পুলিশ এবং প্রশাসন তো বটেই, বিচার বিভাগও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বলা হয় বিচার বিভাগ স্বাধীন, কিন্তু মানুষ দেখেছে আওয়ামী লীগের অধীনে স্বাধীন। আওয়ামী লীগ যেভাবে চেয়েছে, বিচারকাজ সেভাবেই চলেছে। কাউকে জামিন দেওয়া বা শাস্তি দেওয়া ক্ষমতাসীন দলের চাওয়া বা ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত। ফলে এখানে বড় ধরনের সংস্কার আনা অপরিহার্য ছিল। কারণ বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও সক্ষমতা দৃশ্যমান না হলে, মানুষের আস্থা ফিরবে না। কিন্তু গত দশ মাসে এক্ষেত্রে খুব কি অগ্রগতি ঘটেছে? একসময় শতাধিক মামলা কাঁধে নিয়ে বছরের পর বছর আদালতের বারান্দায় ঘুরেছেন যারা, তারা একসঙ্গেই সব মামলায় খালাস পেয়ে গেলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রশ্ন তৈরি হলো যে, আগে কেন জামিন বা খালাস পাননি? আইন ও বিচার তাহলে নিজের গতিতে চলেনি? এখন যেভাবে চলছে, সেটাও কি স্বাভাবিক গতি?

পুলিশ এবং প্রশাসন দিয়ে কি মব সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে? দেশে প্রতি ৮০০ জন মানুষের জন্য একজন পুলিশ আছে, তার ওপর সেই পুলিশের ওপর আস্থা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর কোনো দেশেই শুধু পুলিশ দিয়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ অপরাধ করেছে বলে তার বাড়ি, অফিস দখল করা কি যুক্তিসংগত? অপরাধের বিচার না হলে যেমন অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যায়, তেমনি মব সন্ত্রাস চলতে থাকলে আইন ও বিচার গুরুত্ব হারায়। তখন যার শক্তি আছে সেই তা প্রয়োগ করতে থাকে আর সাধারণ মানুষ এর শিকার হয়। এত বিপুল জাগরণের মাধ্যমে যে অভ্যুত্থান হলো, তার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা কী ছিল? ২৪-এর জুলাই গণ অভ্যুত্থানের অঙ্গীকার ছিল দেশে বৈষম্যের বেদনা থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশা-লিঙ্গ নির্বিশেষে সব মানুষের মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত রাখা হবে। মব সন্ত্রাস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সরকারের কার্যকর ভূমিকার অভাবে সেই অঙ্গীকার প্রতিনিয়ত উদ্বেগজনকভাবে লজ্জিত হচ্ছে।

পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষের যে লড়াই অভ্যুত্থানের জন্ম দিল, বিজয়ের পর তা কেন উচ্ছৃঙ্খলতা, সন্ত্রাস, দখলবাজি ও সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থের কাছে হেরে যাবে? অন্যায়ের পাল্টা অন্যায় করলে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে কীভাবে? মবের নামে ভয়ের সংস্কৃতি ফিরে এলে ক্ষতি হবে সবার। এর বিরুদ্ধের জনতার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন, থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় যানবাহনের নিবন্ধন-রুট পারমিট, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের দাবি

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছিল— বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প, মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এই সরকার সেগুলো কী বন্ধের কোন উদ্যোগ নিয়েছিল? নেয়নি। তা হলে কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করবেন কীভাবে? দেশে যানবাহনে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হয় সেগুলো কার্বন নিঃসরণ করে। সেগুলোর জ্বালানি কী শূন্য কার্বন নিঃসরণ করা হয়েছে? হয়নি। তা হলে উপায় কী? ব্যাটারি রিকশায় কার্বন নিঃসরণ করে না। ফলে যেগুলো কার্বন নিঃসরণ করে সেগুলো বন্ধ না করে যেগুলো কার্বন নিঃসরণ করে না; ব্যাটারি রিকশা সেগুলো বন্ধ করছেন! তা হলে আপনার মুখের কথা আর কাজের নীতি বিপরীত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বেকারত্বকে জাদুঘরে পাঠাবেন। জাদু দিয়ে শূন্য তত্ত্ব বাস্তবায়িত হয় না। এই ব্যাটারি

রিকশার সাথে যুক্ত কোটি কোটি মানুষকে বেকার করে, বেকারত্বকে কীভাবে জাদুঘরে পাঠাবেন? অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ৩০ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়েছে। আপনি দেশে কিছূই করতে পারেননি আর বিশ্বব্যাপী বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। জনগণ কথায় ফোয়ারায় ভরসা রাখে না, বিশ্বাস করে না, বাস্তব কর্ম পরিকল্পনা ও কাজ দেখতে চায়।

সমাজে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ও আচার-আচরণে এই পেশাকে অমর্যাদাকর হিসাবে দেখা হয়। সব শ্রমজীবির ক্ষেত্রেও একই মানসিকতা কাজ করে। এর পরিবর্তন করতে হবে। শ্রমজীবির সেবা দিয়ে সমাজে ভূমিকা রাখে, মানবিক ও মানবতার কাজ করে, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ভূমিকা রাখে, অর্থনীতিতে, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে। এদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এই লড়াইকে মানবমুক্তির লড়াইয়ে রূপান্তর করতে হবে।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা শ্রম সংস্কার কমিশন সারাদেশের প্রতিটি শহরে ইজিবাইক শ্রমিকদের সাথে বসেছি এবং তাদের সমস্যার কথা শুনেছি। আমরা আপনাদের কষ্ট–ক্ষোভ এবং যন্ত্রণার কথা জানি। শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করে, ছাঁটাই বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। চালকরা সে দাবি করেনি। তারা বলেছে কাজ করে জীবন নির্বাহ করতে চায়। এর জন্য নীতিমালা চায়, আইনি সুরক্ষা চায়। নীতিমালা করতে সরকারের সমস্যা কোথায়? এর জন্য তো পয়সা খরচ হয় না। ’২৪-এর অভ্যুত্থানে যখন আন্দোলনে গুলি হচ্ছে তখন এই রিকশা চালকরা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। তাই বলা হয়েছে জরুরি পরিস্থিতিতে রিকশা চলন্ত এম্বুলেন্স। ওই আন্দোলনে অর্শত রিকশা চালক নিহত হয়েছে। জীবন দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। শুধু তাই নয়, অভ্যুত্থানের শুরু করেছে

এই চাকরা। রিকশা চালকরা অপরাধ করলে তাদের জীবিকার উপকরণ ধ্বংস করা হয়। আর ভিআইপিরা অপরাধ করলে তাদের জরিমানা করা হয়। এই অবস্থা চলতে পারে না। আমাদের ২৫টি প্রধান সুপারিশ আছে। এর মধ্যে আমরা সুপারিশ করেছি শ্রমিকের জীবিকার উপকরণ ধ্বংস করা যাবে না। রিকশা চালকের রিকশা ভাঙা যাবে না, জেলের জাল ধ্বংস করা যারে না। আমরা এই সুপারিশের বাস্তবায়ন চাই। করোনায যখন কেউ ছিল না তখন রিকশা ছিল, বন্যায়-খরায় তারা থাকে। হরতাল আন্দোলনে তারা থাকে। তাদের লাইসেন্স দিতে হবে, যাতে তারা নিরাপদে রিকশা চালাতে পারে। বুয়েট রিকশার মডেল তৈরি করেছে কিন্তু সেটা যাতে গুটিকয়েক সিভিকেটের হাতে চলে না যায়, তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। লক্ষ লক্ষ রিকশা একটা দুটা কারখানায় উৎপাদন করা যাবে না।

চা-শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত



চা-শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, ৬০০ টাকা দৈনিক মজুরি, ভূমি অধিকার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য অধিকারসহ মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠাসহ ৭ দফা দাবি আদায়ের সংগ্রামকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে ২৫ মে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে কনভেনশন ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বিপ্লব মাদ্রাজি পাশির সভাপতিত্বে ও সংগঠনের উপদেষ্টা অ্যাড. আবুল হাসান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কনভেনশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ মৌলভীবাজার জেলা শাখার সমন্বয়ক অ্যাড. মঈনুর রহমান মগ্ন, হবিগঞ্জ জেলা শাখার সমন্বয়ক অ্যাড. জুনায়েদ আহমেদ, সিলেট জেলা শাখার আহবায়ক আবু জাফর, বাংলাদেশ চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফোরামের সভাপতি পরিমল

সিং বাড়াইক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম মৌলভীবাজার জেলা শাখার সভাপতি ফ্লোরা বাবলি তালাং, চা শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ঘোষ, সাংগঠনিক সম্পাদক কিরণ গুরু বৈদ্য এবং বিভিন্ন বাগান পঞ্চায়েত কমিটি এবং চা শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, চা-শ্রমিকরা তাদের শিকড় থেকে উচ্ছেদ হয়ে ১৭০ বছরের বেশি সময় ধরে বঞ্চনা ও প্রতারণার ইতিহাস বয়ে বেড়াচ্ছেন। তাদের মিথ্যা তথ্য ও উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে প্রতারণা করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, চা বাগানে সরেজমিন পরিদর্শন করেছি ও চা-শ্রমিকদের নিয়ে বাগানে কাজ করেন এমন সংগঠন ও ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে এদের অবস্থা বুঝার চেষ্টা করেছি। চা-শ্রমিক ও বাগানের ওপর লেখা অনেক প্রকাশনাও সংগ্রহ করেছি। বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে দেখছি শ্রমিকদের দুঃখ-বঞ্চনার বিষয়গুলো। এসব তথ্য-উপাত্ত থেকে সমাধানের রাস্তা বের করতে হবে। কীভাবে শ্রমিকের কল্যাণ

হয় এই শিল্প রক্ষা করা যায় সেভাবেই কাজ করতে হবে। তাদের মানসম্মত দৈনিক মজুরি, যা তারা ৬০০টাকা দাবি করেছে এটা যৌক্তিক তা নিশ্চিত করতে হবে। ভূমির অধিকার, রেজিস্ট্রার ডাক্তার, সন্তানের শিক্ষা, মর্যাদাপূর্ণ জীবনের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। চা-শ্রমিকদের পুষ্টিহীনতা উদ্বেগের বিষয়। তাদের রেশনের পরিমাণ বাড়তে হবে।

তিনি আরও বলেন, চা বাগানে ৭টি ভ্যালি রয়েছে। আমরা এই ৭টি ভ্যালিতে আলাদা আলাদা কনভেনশনের আয়োজন করবো। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের কথা শোনবো এবং চা-শ্রমিকদের দাবির বিষয়গুলো বাস্তবায়নে কাজ করবো।

সিলেট

২০ মে চা-শ্রমিক দিবসে সবেতন ছুটি ঘোষণার দাবি

ঐতিহাসিক ২০ মে চা-শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ

হিসেবে ২৩ চৌহাট্টা মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাহিত্য আসর কক্ষে এক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের সিলেট জেলা আহ্বায়ক বিরেন সিং-এর সভাপতিত্বে ও সদস্য শিপন পাল-এর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম, বাসদ সিলেট জেলা আহ্বায়ক আবু জাফর, বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা উজ্জ্বল রায়, প্রণব জ্যোতি পাল, সংস্কৃদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল করিম কিম, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সিরাজ আহমেদ, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সিলেট জেলা আহ্বায়ক নাজিকুল ইসলাম রানা, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেট জেলা শাখার মুখলেছুর রহমান, চা-শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের আহ্বায়ক হুদেদ মোদি, চা-শ্রমিকদের ১০ দফা বাস্তবায়ন সংগ্রাম কমিটির সভাপতি সবুজ তাঁতি, ছড়াগাও বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের সদস্য রতন বাউরি প্রমুখ।



‘জুলাই গণ অভ্যুত্থানে নারীর ভূমিকা ও বর্তমান বাস্তবতা’ শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত



সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীর ভূমিকা ও বর্তমান বাস্তবতা’ শীর্ষক আলোচনাসভা ১৯ জুলাই রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, ঢাকা নগরের সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ি। এ ছাড়াও আলোচনা করেন জুলাই আন্দোলনের সম্মুখ সারির লড়াইক যোদ্ধা সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক রিনা মুর্শু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল প্রত্নতি কমিটির সদস্যসচিব অদিতি ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠক সোহাগী সামিয়া, বিনাইদহ জেলার সভাপতি শারমিন সুলতানা, বগুড়া জেলার আহ্বায়ক নিয়তি সরকার, নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক নাসিমা সর্দার। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিলরুবা নূরী।

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

জুলাই অভ্যুত্থানে সকল শহিদের স্মরণে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সারাদেশে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন



ওপরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখা ২ নিচে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মসূচি পালিত



কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আত্মায়ক কমরেড জাহেদুল হক মিলুর সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৩ জুলাই ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন উপদেষ্টা কমরেড খালেদুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলফিকার আলী, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব বুলবুল, রিকশা-ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের আত্মায়ক খালেদুজ্জামান লিপন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, প্রগতিশীল আইনজীবী ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জহিরুল ইসলাম মোল্লা, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুক্তা বিশ্বাস, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুক্তা বাউড়ে। সভার শুরুতে তার স্মৃতিপ্রতি সম্মান জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

কমরেড খালেদুজ্জামান বলেন, জাসদের অভ্যন্তরে তখন মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছিল, কমরেড জাহেদুল হক মিলু যেহেতু ঢাকার বাহিরে থাকতেন সেখান থেকে সে বিতর্কের বিষয়গুলো নানাভাবে সংগ্রহ করতেন, দলটা কীভাবে এগোচ্ছে তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন ও প্রকাশনার বক্তব্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন এবং ঢাকায় এসে সেগুলো নিয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে কথাবলে বুঝতে চাইতেন, একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করতেন। বিতর্ক করার সময় তার কথা বলার ধরন ছিল সহজ-সরল অথচ বলিষ্ঠ ও দৃঢ় কিন্তু চোখে-মুখে ছিল নমনীয়তার ছাপ।

কমরেড মিলু মাঝে মাঝে এসে নিজের সম্পর্কে বলতেন—একজন পেশাদার বিপ্লবী সম্পর্কে তার ও মানুষের সামনে যে ধারণা ও ছবি ফুটে ওঠে—তার সে যোগ্যতা নেই এবং সে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপযুক্ত নয়। সময়ের সাথে নিজেকে তৈরি করতে পারছি না। আমরা তখন তাকে বলেছিলাম, দল অগ্রসর হচ্ছে মানে দলের কমরেডরাও বিকশিত হচ্ছে। তাদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বাড়ে, জ্ঞানের উন্নতি হয়, নেতৃত্ব ও দল বিকশিত হয়। কমরেডরা অগ্রসর না হলে দল অগ্রসর হতে পারে না। বিষয়টি দ্বন্দ্বিক নিয়মেই অগ্রসর হয়। অর্থাৎ দলের বিকাশ হলে নেতৃত্বের চেতনা ও তত্ত্বগত মান বাড়ে; আবার নেতাকর্মীদের বিকাশ হলে দলেরও বিকাশ ঘটে।

কমরেড খালেদুজ্জামান বলেন, সমাজের কোনো মানুষই এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে না। হয় তার মধ্যে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের রাজনীতি-অর্থনীতি, চিন্তা-চেতনা, রুচি-সংস্কৃতি, মানসিকতার প্রভাব বাড়তে থাকবে, অথবা সর্বহারা চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতির প্রভাব থাকবে। বিপ্লবীদের বুর্জোয়া চিন্তা ও প্রতিবিপ্লবী চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগোতে হয়। একজন বিপ্লবীর নিজের মধ্যে আত্মসচেতনা থাকতে হবে, ক্রমাগত বিজ্ঞানসন্মত যুক্তিবাদী চিন্তায় নিজেকে বিকশিত করে তুলতে হয়। লড়াই-সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে হয়। বস্তুজগতের সবকিছুই পরস্পরবিরোধী বা বিপরীত সত্তা নিয়ে গঠিত। শুরুতে যারা বিপ্লব করতে আসেন যে জ্ঞান নিয়ে শুরু করেন নিজেকে বিকশিত না করতে পারলে একটা সময়ে তা অপরিণত হয়ে যায়, বন্ধ্যাদশা তৈরি হয়। ক্রমবিকাশমান বস্তুজগতের সাথে সমাজ, মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ আদর্শ সবকিছুই পরিবর্তিত হতে থাকে—নিম্নস্তর থেকে উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়। একথা সকল মানুষের মতো একজন বিপ্লবীর জন্যও সত্য। একজন বিপ্লবী কর্মীর মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, লোভ-লালসার



বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম থাকতে হবে। শ্রেণির সাথে একীভূত হওয়ার নিরলস সংগ্রাম থাকতে হবে। মানুষকে বঞ্চিত করা ও ঠাকানোর মনোভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। বুর্জোয়াদের সকল ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। একজন বিপ্লবীর দক্ষতা-যোগ্যতা শুরুতে যাই থাক, সে যদি লড়াইয়ের মধ্যে থাকে দিনে দিনে আরও যোগ্য হয়ে ওঠবে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ যেমন অপরাধী হয়ে জন্মায় না তেমনি বিপ্লবী হয়েও জন্মায় না। এগুলো সংগ্রাম-আপসকামিতার প্রবণতা থেকে আসে। সমাজ যখন শ্রেণি বিভক্ত থাকে, মানুষও শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করে। কারও পক্ষে এর বাইরে থাকার সুযোগ নেই। বিপ্লবী হতে গেলে ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা লাগে। নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। কমরেডদের সাথে জীবন-জগতের নানা বিষয় নিয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করে একটা যৌথতা গড়ে তুলতে হয়। দলের নির্দেশিত লড়াইয়ের পথে পরিচালিত হয়ে বিপ্লবী নিজেকে তৈরি করতে থাকে। প্রাকৃতিক বিকাশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে হয় কিন্তু চেতনাগত বিকাশের জন্য নিজস্ব উদ্যোগ ও সামাজিক সংগ্রাম লাগে। সামাজিক সংগ্রামের বাইরে গিয়ে তা হয় না।

কমরেড খালেদুজ্জামান বলেন, কমরেড মিলু'র একটা গুণ ছিল—তার সমালোচনা করলে সে নির্মোহভাবে সেটা গ্রহণ করতে পারতেন। তাকে করা সব সমালোচনাই যে সঠিকভাবে হয়েছে এমন নয়, অনেক ভুল সমালোচনাও হয়েছে। সে কমরেড নিজের ভুল ও দোষ থেকে নিজেকে শোধরাতে চেষ্টা করতেন। আমরা এই আলোচনাগুলো এখন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতে যাতে এগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়। ভবিষ্যতের ভুল থেকে বাঁচতে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া। মানুষের মধ্যে যেমন গুণের বিষয় থাকে তেমনি দোষ ও ভুল ধারণাও থাকে। মানুষের গুণের পরিমাণ যত বাড়তে থাকে দোষের পরিমাণ তত কমতে থাকে; আবার এর বিপরীতটাও হয়। দোষ ও গুণ এর কোনোটাই নিঃশেষ করে দেওয়া যায় না।

আমরা যারা সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম করছি আমাদের কাছে দোষ-গুণের ব্যাপারটা হচ্ছে—এই পুঁজিবাদী সমাজ পরিবর্তনের যত বেশি ভূমিকা রাখছেন, যত বেশি মানুষকে এই আন্দোলনে যুক্ত করতে পারছেন, যত বেশি শ্রেণির সাথে একাত্ম হতে পারছেন সেটা গুণ। আর প্রতিক্রিয়ার উপাদানসমূহকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারটা হচ্ছে দোষের। বিপ্লবী কাজে ভূমিকা ঠিক ঠিকভাবে পালন না করা, উদাসীন থাকাটা দোষের। প্রগতির ধারার সাথে চললে জীবনটা বিকাশমান হবে, প্রতিক্রিয়ার সাথে থাকলে জীবন অবক্ষয়ী হবে। আজকে যাদের আমরা খারাপ বলছি এরা প্রতিক্রিয়ার রাজনীতির সাথে যুক্ত, লুটপাটের পক্ষের, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিপক্ষে এদের অবস্থান।

তিনি আরও বলেন, আমাদের কমরেডদের মানুষ প্রশংসা করে কেন? কারণ, মানুষ দেখছে এই দলের কর্মীরা শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি

মানুষের অধিকার ও স্বার্থের পক্ষে লড়াই করছে, দেশের স্বার্থে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এখানকার বুর্জোয়া কায়মি স্বার্থবাদীদের যে রাজনীতি, অর্থনীতি, রুচি-সংস্কৃতি, মানসিকতা এই দলের কর্মীরা তার পক্ষে যাবে না। এই অবস্থাটা একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করে।

বুর্জোয়া পরিবার হচ্ছে স্বার্থকেন্দ্রিক আর সর্বহারাশ্রেণির মুক্তির লড়াইয়ের সাথে যুক্ত থেকে সর্বহারা স্বার্থের পরিবারিক বন্ধন তৈরি হয়। বন্ধন যত দৃঢ় হয় দলের অভ্যন্তরীণ শক্তি তত বৃদ্ধি হয়, প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করা সহজ হয়। শরীরে যদি প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি থাকে রোগে আক্রান্ত তত কম হয়।

কমরেড মিলু দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ছোটখাট বিষয় খেয়াল রাখতেন। আমরা স্মরণসভা করি এর অর্থ হচ্ছে তার জীবনের ভালো-মন্দ, চরিত্রের মাধুর্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি, শক্তি অর্জন করি।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, বিপ্লবী আন্দোলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় ও সংগ্রামে শিক্ষা-অভিজ্ঞতা থাকে যা আমাদের বার বার আলোচনা করতে হয়, জানতে-বুঝতে হয়। এভাবে নিজেকে বিকশিত করতে হয়, অন্যদের বিকাশের পথ তৈরি করে দিতে হয়। আমরা যত বার মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন-এর মৌলিক শিক্ষাগুলো জানবো আমাদের উপলব্ধি নতুন মাত্রায় উন্নীত হবে।

সমালোচনা আনন্দের অনুভূতি দেয় না, নিজের দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি, দুর্বলতা অভিযোগ অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালো লাগে না। আমার চরিত্রে যদি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা দলের কাজ, কমরেডদের সাথে সম্পর্ক, বিপ্লবী আদর্শের জন্য খারাপ, জনগণের জন্য খারাপ তা তো আমাকে পালটাতেই হবে। যিনি সমালোচনা নির্মোহভাবে গ্রহণ করে বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজেকে শোধরাতে পারেন তিনি অনেক বড় গুণের বিপ্লবী হতে পারেন, উন্নত মানুষ হতে পারেন। অন্য কমরেডরাও আলোচনায় বলেছেন, কমরেড জাহেদুল হক মিলু নির্মোহভাবে সমালোচনা গ্রহণ করতে পারতেন। আমাদের পার্টিতে স্তরে স্তরে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার বিষয়টি সব সময় জারি ছিল, এখনও আছে। বিগত দিনে আমাদের পার্টি নেতৃত্ব সম্পর্কে একটা ফোরামে সমালোচনা আহ্বান করেছে। কমরেডরা দীর্ঘ সময় ধরে নেতৃত্ব সম্পর্কে সঠিক-বেঠিক সব কথা অবলীলায় মনস্থলে সমালোচনা করেছেন। নেতৃত্ব সেগুলো গ্রহণ করেছে, বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজেদের শোধরানোর সংগ্রাম করছেন।

তিনি আরও বলেন, কমরেড মিলু অন্য কমরেডদের গুণ-দক্ষতা, যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতেন। বয়সে ছোটদেরও নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। পার্টির প্রতি আনুগত্যের একটা গুণ তার মধ্যে ছিল। আবার পার্টির অভ্যন্তরে ভুল চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে তিনি মেনে নিতেন না। তার জন্য বিতর্ক করতেন। পার্টির প্রয়োজনকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। পার্টির প্রয়োজনে যেখানে যে কাজ ও যে দায়িত্ব তাকে দেওয়া হতো তিনি সে দায়িত্ব হাসি মুখেই গ্রহণ করতেন। এর অসংখ্য

নজির আমাদের সামনে আছে। নিজের সাংগঠনিক এলাকার বাইরেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মধ্যে ছোট-বড় সবার সাথে বন্ধুবৎসল সম্পর্ক ছিল। শুধু পার্টি কমরেডদের সাথেই যে এ সম্পর্ক ছিল এমন নয় অপরাপর রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এ ক্ষেত্রে বয়স কখনও প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করতো না। তার মৃত্যুর পর নিজ জেলা কুড়িথামের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের মধ্যে আমরা সেটা দেখেছি।

সব মানুষের মধ্যে সব গুণ থাকে না। তার বক্তব্য প্রকাশের দুর্বলতা থাকলেও রাজনীতি বুঝার প্রজ্ঞা ছিল প্রগাঢ়। ছাত্র জীবনে স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেওয়া, পরবর্তীতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন গ্রহণ করে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির পথ সমাজতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং আজীবন সে সংগ্রামে অবিচল থাকা তার প্রমাণ।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একটা জটিল মূহূর্ত অতিক্রম করছে। অন্তর্বর্তী সরকার একদিকে তার প্রধান করণীয় নির্ধারণ করতে পারছে না, অন্যদিকে দায়িত্বের বাইরে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইচ্ছাপূরণ করে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। দেশকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যেমন, প্রথমত, অযৌক্তিকভাবে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার ভার দুবাইভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ড নামের একটি বহুজাতিক লজিস্টিক কোম্পানির হাতে তুলে দিতে তৎপর। এটা অর্থনীতির জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি নিরাপত্তার জন্যও হুমকি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন মিয়ানমারের বিরোধপূর্ণ রাখাইন রাজ্যে কথিত ‘মানবিক করিডোর’ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। রাখাইন রাজ্যের বেশিরভাগ এলাকা এখন মার্কিন মদদপুষ্ট আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। মিয়ানমার সরকার কার্যত সব কিছুর সরবরাহ বন্ধ রেখেছে। মিয়ানমারকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ চলছে। ফলে, এই পরিস্থিতিতে রাখাইনে করিডোর দিলে বাংলাদেশ পরাশক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব জড়িতে যেতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রধান উপদেষ্টা এপ্রিল মাসে কাতার সফরকালে বাংলাদেশে তাদের জন্য সমরাস্ত্রের যন্ত্রাংশ তৈরির অর্থনৈতিক জোন গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের মাটিতে ভিন দেশের সমরাস্ত্রের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা স্থাপন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য কতটা হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

তিনি বলেন, ক্ষমতায় এসে প্রধান উপদেষ্টা ঢাকায় তার নিজের ● ‘গ্রামীণ ইউনিভার্সিটি’ নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন নিয়েছেন, যা আবেদনের মাত্র তিন মাসের মধ্যে অনুমোদিত হয়। ● জনশক্তি রপ্তানির জন্য গ্রামীণ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (জিইএসএল) বিএমইটি থেকে লাইসেন্স নিয়েছে। ● গ্রামীণ টেলিকমের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ‘সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেড’ পেমেট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) লাইসেন্স নিয়েছে। ● ২০২৯ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংককে কর অব্যাহতি নেওয়া হয়েছে। ● সরকারি শেয়ার ২৫% থেকে কমিয়ে ১০% করা হয়েছে। ● প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পর ড. ইউনুসের বিরুদ্ধে থাকা শ্রম আইন লঙ্ঘন ও অর্থপাচারের মামলা দ্রুত খারিজ হয়ে যায়, যা ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এসব নিয়ে জনমনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দাবি বাড়ছে।

কমরেড ফিরোজ দ্রুত সংস্কার সম্পন্ন করে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা প্রদানের জোর দাবি জানান।

জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বাসদের মাসব্যাপী কর্মসূচি

জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার, প্রয়োজনীয় সংস্কার, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার দাবি

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরের কাজের স্বেতপত্র প্রকাশের দাবি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের উদ্যোগে ৩ জুলাই '২৫ জাতীয় প্রেসক্রাফের সামনে জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মাসব্যাপী নানা আয়োজনের উদ্বোধনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সহসভাপতি জয়নাল

আবেদীন মুকুল, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইশরাত জাহান লিপি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাউড়ে। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এক মাস পর জুলাই অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তি হবে। বাংলাদেশের মানুষ এক অপ্রতিরোধ্য লড়াই আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল এই জুলাই মাসে। সে সময় মানুষ স্লোগান তুলেছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে, এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১



মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে হতাহতের ঘটনায় শোক ও সমবেদনা প্রকাশ

বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২১ জুলাই সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে উত্তরায় মাইল স্টোন স্কুলে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী হতাহতের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ এবং আহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন আহতদের রাষ্ট্রীয় খরচে সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান ঢাকা মহানগরের

মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রশিক্ষণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এ বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়া এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধের জন্য বিমান বাহিনীসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। একইসাথে নিহত-আহত সকলকে ক্ষতিপূরণ ও আহতদের রাষ্ট্রীয় খরচে সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রদানেরও আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ আহতদের রক্তদানসহ উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা ও চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য ঢাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। একই সাথে বাসদের উত্তরাসহ ঢাকা শহরের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের রক্তদানসহ সহায়তা কাজে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি

শোষণ-বৈষম্য বিলোপ ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জারি রাখুন



জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১ আগস্ট নারায়ণগঞ্জ শহিদ মিনারে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন (ওপরে)। জমায়েরের একাংশ নিচে।

ছাত্র-জনতার আকাজক্ষার পথে হাঁটছে কী বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট



সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে 'জুলাই গণ অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি : ছাত্র-জনতার আকাজক্ষার পথে হাঁটছে কী বাংলাদেশ?' শীর্ষক সেমিনার ৩০ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি

মজুমদার হলে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ে এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিনের এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

বাজেটে গণ অভ্যুত্থানের গণ আকাজক্ষা বৈষম্যমুক্তির কোন প্রতিফলন নেই

বাজেট গতানুগতিক, ধনিক-কালোটাকার মালিক ও আমলা তোষণের ধারাবাহিকতা মাত্র

বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বাজেট প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ৩ জুন '২৫ গণমাধ্যমে প্রদত্ত বিবৃতিতে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট সম্পর্কে বলেন, বাজেট '২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের গণ আকাজক্ষা বৈষম্যমুক্তির কোন প্রতিফলন নেই। বাজেট গতানুগতিক, ধনিক, কালোটাকার মালিক ও আমলা তোষণের ধারাবাহিকতা মাত্র বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম ও শত শত মানুষের আত্মহুতির মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদী সরকারের পলায়নের পর বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্বে এটা প্রথম বাজেট। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই দেশের মানুষ এবারের বাজেটে তাদের আকাজক্ষার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় অর্থ উপদেষ্টা

শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নাগরিক সুবিধা, সুশাসন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করলেও বাজেটে তার কোন প্রতিফলন নেই। বাজেটে বেসামরিক-সামরিক আমলাখাত, সুদ পরিশোধ, প্রতিরক্ষা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসহ অনুৎপাদনশীল খাতে বেশিরভাগ টাকা বরাদ্দ অতীতের ফ্যাসিবাদী সরকারের ধারাবাহিকতা মাত্র।

এখানে কোন নতুনত্ব বা পরিবর্তন নেই বরং জুলাই চেতনার পরিপন্থী। বাজেটের খাতওয়ারী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় বাজেট কমেছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে, জাতীয় বাজেটের ১২% ও জিডিপির ২%। যা বিগত বাজেটের মতো একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। বরং শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির হিসাবে গতবারের তুলনায় কমে গেছে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ মূল্যস্ফীতি হিসাবে কমেছে এবং কৃ

ষি খাতে বরাদ্দও গতবারের তুলনায় কমানো হয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষি-শ্রম ও প্রবাসী কল্যাণ খাতে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ কমানো হয়েছে যা উদ্বেগজনক।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, বাজেটে শ্রমিক-কৃষকসহ সবধরনের মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার পরিবর্তে শ্রমিকের জন্য শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমাকৃত টাকা উত্তোলনে ১০% কর আরোপ করা হয়েছে। এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত কোন শ্রমিক অসুস্থতাজনিত বা অন্য কারণে এই তহবিল থেকে ১ লাখ টাকা পেলে তার থেকে ১০ হাজার টাকা কেটে রাখা হবে। অথচ লুটেরা ও ধনিক গোষ্ঠীর কালোটাকা বা অপপ্রার্থিত আয়কে সাদা করার সুযোগ এবারেও দেওয়া হয়েছে। যা ২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের চেতনার পরিপন্থী ও শত শত শ্রমিকের আত্মহুতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

বেকার সমস্যা সমাধান ও কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। এই বাজেটে উলটো সাধারণ ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতে ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দও গত বাজেটের তুলনায় কমেছে। যা সংকটকে আরও বৃদ্ধি করবে। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী ইতিমধ্যে ৩০ লাখ মানুষ নুতন করে অতিদরিদ্র হয়েছে। এ বিষয়েও সরকারের কোন পদক্ষেপ নেই।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, লুটেরা ও ধনিকশ্রেণি, কালোটাকার মালিক ও আমলা তোষণের নীতির অতীতের গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের চেতনা এবং গণমানুষের গণ আকাজক্ষা অনুযায়ী শোষণ-বৈষম্যমুক্ত সমাজের লক্ষ্যভিমুখী জাতীয় বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে বাজেট সংশোধনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ইরানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে বাম জোটের সমাবেশ ও বিক্ষোভ



ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলের বর্বর হামলা ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ২৩ জুন ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির দ্বার প্রান্তে এমন অনুমানের ভিত্তিতে ২২ জুন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ইসরায়েলি জায়নবাদ সকল আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে সে দেশের পারমাণবিক স্থাপনা, মিসাইল কমান্ড, প্রশাসনিক ভবন, কারাগার, বিমান বন্দর, রাডার ও এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, বাসগৃহসহ সাধারণ নাগরিকদের বাসভবনে বর্বরোচিত হামলা পরিচালনা করে। এর আগে ১৩ জুন থেকে ইসরায়েল আমেরিকার মদদে ইরানে শত শত হামলা পরিচালনা করে। মার্কিন এবং ইসরায়েলি হামলায় ইরানের উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী ও শিশু-নারীসহ অসংখ্য সাধারণ নাগরিক

নিহত হয়, ৫ হাজারের অধিক মানুষ আহত হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দ এই হামলার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অতীতেও আরববিশ্বের বিভিন্ন দেশে হামলা চালিয়ে শুধু মানুষ হত্যা করেনি তারা দেশগুলোকেও ধ্বংস করেছে। অস্ত্র বিক্রি, বাজার দখল, আধিপত্যবাদ কায়েমের জন্য সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে এ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্য আনতে গেলে ইসরায়েল সে সব বুড়ুক্ষু নারী-শিশুসহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। তারা ক্ষুদাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। গাজার প্রতিটি মানুষ অনাহারের শিকার। সেখানে খুব সীমিত পরিমাণে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে জাতিসংঘের ত্রাণ। সেখানেও চলছে লুটপাট। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদে এ হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত করেছে ইসরায়েল।

শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

২৬ জুন '২৫ শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের নেতৃত্বে সকাল নয়টায় শহিদ জননী জাহানারা ইমামের মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস, সদস্য শম্পা বসু, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য মাজিন উদ্দিন চৌধুরী, কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সদস্য শাহজাহান কবীর, রুখশানা আফরোজ আশা, নাসির উদ্দিন প্রিন্স, আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে কমরেড ফিরোজ বলেন, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ জননী জাহানারা ইমাম স্বামী-সন্তান হারান। পরিবারের ও দেশের জন্য অপরিসীম ত্যাগ তাকে শোকাহত করলেও তিনি কোনোদিন লড়াইয়ের মাঠ ত্যাগ করেননি। এই মর্মান্তিক বেদনাকে তিনি শক্তিতে রূপান্তরিত করে সকল শহিদের মা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি বলেছেন, 'আমি মাটির প্রদীপ। আমার কর্তব্যটুকু সলতের শেষ তেল বিন্দুটি পর্যন্ত করে যাবার চেষ্টা করবো'। জাহানারা ইমাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক।



কমরেড ফিরোজ ক্ষোভের সাথে বলেন, '৭১ সালে স্বাধীনতার পর তৎকালীন সরকার যুদ্ধাপরাধীদের যথাযথ তালিকাও প্রণয়ন করেনি! বিগত সরকারের সময়ে কতিপয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলেও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়নি বরং শাসকশ্রেণির দলসমূহ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে ছিল ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে কে-কত বেশি রাজনীতিতে ব্যবহার করবে, ভোটে ব্যবহার করবে। সে জন্য এদের নানা ধরনের সহযোগিতা দিয়ে তুষ্ট করা-খুশি করার চেষ্টা করেছে।

স্বাধীনতার ৫৪ বছরে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া দলগুলো পালাক্রমে দেশ পরিচালনা করলেও তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে কাজ করেছে। গত বছর জুলাই-আগস্টে ফ্যাসিবাদী দৃষ্টান্তসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ১০ মাস

অতিবাহিত হয়েছে এ সময় ধর্মাক্ষ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর আক্ষালন সীমা ছাড়িয়েছে। কথিত তৌহিদ জনতার নামে নারীদের পোশাক নিয়ে মোরাল পুলিশিং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন বেড়ে গেছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, কথিত ধর্ম অবমাননার নামে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষকসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দ্বারা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে। মব সন্ত্রাসের আতঙ্ক বিরাজ করছে, ২ দিন আগেও লালমনিহাটে নরসুন্দর পিতা-পুত্রকে লাঞ্ছনা করেছে উগ্রধর্মাক্ষ গোষ্ঠী। একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী একে 'জনরোষ' হিসেবে আক্ষা দিয়ে এর পক্ষে সাফাই গাচ্ছে। এমনকি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মবকে ক্ষুদ্র মানুষে 'প্রেসার গ্রুপ' বলে ন্যারেটিভ দেন। এ ধরনের পরিস্থিতি নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগজনক।

দুনীতিগ্রস্ত-দুর্বৃত্তায়িত আদর্শহীন বুর্জোয়া রাজনীতি দেশকে আজ চরম অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দুর্গতি ও দুর্দশার জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। তিনি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধসহ গণতন্ত্র, ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

মহিলা ফোরামের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

শহিদ জননী মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু, ঢাকা নগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা, সংগঠক লিপি আক্তারসহ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি মুক্তা বাউড়, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহাইল আহমেদ শুভ ও দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাস এর নেতৃত্বে শহিদ জননীর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মুক্তা, রুবায়া, ইমরানসহ নেতৃবৃন্দ।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সংগঠনের কেন্দ্রী কমিটির সভাপতি নিখিল দাস, সহসভাপতি শাহজাহান কবীর, কামরুজ্জামান খোকন ও সংগঠক ইলিয়াস হাসান ইলুর নেতৃত্বে শহিদ জননীর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

মুরাদনগরে নারী ধর্ষণ ও নিপীড়নের ঘটনার সূচু তদন্ত ও বিচার দাবি

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

কুমিল্লার মুরাদনগরে নারী ধর্ষণ ও নিপীড়নের ঘটনার প্রতিবাদ এবং সূচু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৯ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম এর কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু, সভা পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট এর সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহিলা ফোরাম

এর সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিলরুবা নূরী, ঢাকা নগরের সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর সভাপতি মুক্তা বাউড়, সহসভাপতি সুমিতা মরিয়ম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা অদিতি ইসলাম। সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য আপা প্রকল্পের আন্দোলন পরিচালনা কমিটির সদস্য রোমানা ইসলাম।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে মুরাদনগরে নারী ধর্ষণ ও নিপীড়নের ঘটনার সূচু তদন্ত ও যথাযথ বিচার দাবি করেন। এবং নারী নির্যাতন রোধে সরকারে সক্রিয় ভূমিকা দাবি করেন। যারা ওই নারীকে নগ্ন ও নির্যাতন করে ভিডিও ধারণ করেছে তাদেরকেও গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ‘রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ এগ্রিমেন্ট’-এর নামে অধীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরের তৎপরতা বন্ধ করণ দেশবাসীকে না জানিয়ে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি করা চলবে না, এনবিআর-এর উপকমিশনার মুকিতুল হাসানকে বরখাস্ত এবং মামলা দেয়ার নিন্দা

বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৮ জুলাই ’২৫ সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে ‘রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ এগ্রিমেন্ট’ বা ‘পারস্পরিক শুল্ক চুক্তি’ এর নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোপন নন-ডিসক্লেজার চুক্তি স্বাক্ষরের তৎপরতা বন্ধ করা এবং এনবিআর এর কর্মকর্তাকে বরখাস্ত এবং মামলা দায়েরের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, দেশবাসীকে আঁধারে রেখে এমন জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি করার কোনো এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। গত ২ এপ্রিল ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশের উপর ৩৭% রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ আরোপের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর তা ২ শতাংশ কমিয়ে ৩৫% করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের প্রায় সকল ধরনের রপ্তানি পণ্যের উপর ১৫% শতাংশ শুল্ক আরোপিত আছে। সবমিলে এখন বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উপর প্রায় ৫০% শুল্ক আরোপ করার কথা বলছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আসলে এর পেছনে লুকায়িত আছে ভিন্ন উদ্দেশ্য।

রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পাল্টা শুল্ক আরোপের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। একই সঙ্গে দেশটি চীনের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লাগাম টানতে আমদানিকারক দেশগুলোকে চাপে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক-অর্থনৈতিক, ভূরাজনৈতিক আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ এবং চীনকে মোকাবিলায় বাংলাদেশকে মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক সামরিক পরিকল্পনায় আট্টেপুটে

রাখা। এর অংশ হিসেবেই ‘রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ এগ্রিমেন্ট’ নামে একটা গোপন চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে মার্কিন বাণিজ্য সংস্থা ইউএসটিআর একটা গোপনীয় চিঠি বা চুক্তির খসড়া বাংলাদেশকে পাঠিয়েছে। ২১ পাতার চিঠির কপিটি মোটা দাগে ৬ ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ ৬ ধরনের শতাধিক শর্ত সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে চুক্তিতে। এগুলো হলো—কর সংক্রান্ত শর্ত, অশুল্ক বাধা সংক্রান্ত শর্ত, ডিজিটাল বাণিজ্য ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত শর্ত, রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত শর্ত, অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত শর্ত এবং বাণিজ্যিক শর্ত। এই চুক্তির নানা শর্ত নিয়ে মার্কিন প্রশাসন, বিভিন্ন আমদানিকারক সংস্থার সাথে আলোচনা চালালেও বাংলাদেশের মানুষকে এ বিষয়ে কিছুই অবগত করা হয়নি। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ বিষয়ে বাংলাদেশের নন-ডিসক্লেজার বা গোপনীয়তার চুক্তি রয়েছে ফলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়! অথচ কেন এই গোপনীয়তার চুক্তি, এই চুক্তি কার স্বার্থ রক্ষা করছে কোন কিছুই দেশের মানুষ অবগত নয়। অবিলম্বে এধরণের গোপনীয়তার চুক্তি বাতিলের দাবি জানান তিনি।

বাসদের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, চুক্তির নানা শর্ত সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে ফাঁস করা হলে আমরা জানতে পারি যে, এই চুক্তি আসলে বাংলাদেশকে মার্কিন দাসত্বে দস্তখত করার চুক্তি ভিন্ন কিছুই নয়। সামরিক, অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে মারাত্মক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলতে পারে এধরনের চুক্তি। যেখানে বলা হয়েছে, মার্কিন বিভিন্ন মানসনদ বাংলাদেশকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতে হবে, আর যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও আইন প্রণয়ন কিংবা স্ট্যান্ডার্ড স্থাপন করতে পারেনি, সেসব ক্ষেত্রে মার্কিন স্ট্যান্ডার্ড প্রতিস্থাপন করতে বলা

হয়েছে। যাতে মার্কিন পণ্য অবাধে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে। মার্কিন সামরিক যন্ত্রাংশ আমদানি বাড়াতে হবে এবং চীনা সামরিক পণ্য আমদানি কমাতে হবে, রাষ্ট্রীয় আকাশ পরিবহন সংস্থা বিমানের মাধ্যমে মার্কিন বেসামরিক

২১ পাতার চিঠির কপিটি মোটা দাগে ৬ ভাগে বিভক্ত

উড়োজাহাজ ও যন্ত্রাংশ আমদানি বাড়াতে হবে, মার্কিন জ্বালানি আমদানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশকে এবং তরল প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি আমদানিতে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করতে হবে, সামাজিক নিরাপত্তা খাতের জন্য মার্কিন গম আমদানি বাড়াতে হবে, সামরিক বাহিনী ও সরকারি সংস্থার জন্য মার্কিন সয়াবিন তেল আমদানি বাড়াতে হবে এবং সয়াবিন সংরক্ষণের জন্য মার্কিন কোম্পানির অংশীদারিত্বে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও শিপিং খাতের বিকাশে যুক্তরাষ্ট্রের সমমানের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, বন্দর-জেটি ও জাহাজে চীনের তৈরি লজিস্টিকস সিস্টেম লগিন্ক (LOGINK) ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে, ব্যুরো অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সিকিউরিটির অনুমতি ছাড়া কোনো ধরনের মার্কিন পণ্য দেশটিতে রপ্তানি, পুনঃরপ্তানি করা যাবে না, বাংলাদেশকে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অংশীদার করতে হবে। ইত্যাদি আরও নানা শর্ত যা বাংলাদেশের

গোপালগঞ্জে এনসিপি’র সমাবেশকে কেন্দ্র করে হামলা, সংঘাতে পুলিশ-সেনাবাহিনীর

গুলিতে ৪ জন মানুষ হত্যা এবং বিভিন্ন মহলের উসকানিমূলক বক্তব্য-কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা

বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৭ জুলাই ২০২৫ সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে এনসিপি-র সমাবেশে ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগের ন্যাক্কারজনক হামলা, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গাড়ি ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সময়মতো ব্যবস্থা না নিয়ে পরে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং গুলি করে ৪ জনকে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব জনগণের জানমাল ও সভা-সমাবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এনসিপি’র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত জানানোর পরই তারা গোপালগঞ্জে যায়। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যর্থতা আমরা যা দেখলাম তা খুবই উদ্বেগজনক।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছরের আন্দোলনে ফ্যাসিবাদী সরকার পদত্যাগ ও দেশ ত্যাগ করার পর জনগণ আশা করেছিল জানমাল ও সভা-

সমাবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকবে কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এর আগেও অভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন জায়গায় মব সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জনগণের রাজনৈতিক অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে, ‘মুজিববাদের আতুর ঘর’ বলে ধানমন্ডির ৩২ নাম্বারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি ভাঙা হয়েছে, সেখানে সেনা সদস্যদের ঠায় নীরবে দাঁড়িয়ে দর্শকের ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক স্থাপনা ভাঙাসহ নানা অসংবেদনশীল কাজ করা হয়েছে কিন্তু সরকার ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত রাজনৈতিক মহল এতে নির্বিকার থেকেছে কিংবা মদদ যুগিয়েছে। পূর্বের মব দমনে এবং মবসন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় একের পর এক মব সন্ত্রাস বেড়েই চলছে। এনসিপি’র সমাবেশে হামলা তারই ধারাবাহিকতা। গোপালগঞ্জের ঘটনার দায় সরকার কোনমতেই এড়াতে পারে না।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, সহিংসতা দমনে ল্যাথাল উইপন বা জীবনঘাতী মারণাস্ত্র ব্যবহার করা নিয়ে গত জুলাই আন্দোলনে তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদ জনপরিসর থেকে জানানো হয়েছিল এর তীব্র সমালোচনাও হয়েছিল। অথচ অভ্যুত্থানের পরই আগুলিয়ায়

গুলি করে শ্রমিক হত্যা এবং গতকাল গোপালগঞ্জে গুলি করে ৪ জন মানুষকে হত্যা করা হলো। এনসিপি’র এই সমাবেশ নিয়ে আগে থেকেই উৎকর্ষা ছিল, তাই সেই সমাবেশের নিরাপত্তা দিতে পর্যাপ্ত আইনি প্রস্তুতি এবং সময়মতো ব্যবস্থা না নিয়ে পরে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করতে গিয়ে এভাবে মানুষ হত্যা করা আমাদেরকে বিগত রেজিমের ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার শাসনকেই মনে করিয়ে দেয়।

গুপ্তু তাই নয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে, রমজান কাজী নামে একজনকে সুস্থ অবস্থায় ধরে নিয়ে ১০ মিনিট পর তাকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ এসেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপত্তা বাহিনীর বীভৎসতার আরও নানা ছবি প্রকাশিত হয়েছে। অবিলম্বে এনসিপি’র সমাবেশে হামলা, আইনশৃংখলা বাহিনীর গুলিতে ৪ জনকে হত্যা, প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে জড়িত ও দায়ীদের বিচার দাবি করা হয়।

বিবৃতিতে বাসদের সাধারণ সম্পাদক আরও প্রশ্ন উত্থাপন করেন, দেশব্যাপী এনসিপি-র শান্তিপূর্ণ জুলাই পদযাত্রা কেন হঠাৎ গোপালগঞ্জে গিয়ে যুদ্ধংদেহি ‘মার্চ টু গোপালগঞ্জ’ হয়ে গেল? এদের দেশি বিদেশি নানা পৃষ্ঠপোষকদের মদদে

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দেবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জাতীয় সম্পদে একচ্ছত্র মার্কিন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যে কোনো সময় তা সুরক্ষার বাহানায় মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের ঝুঁকিও থাকবে।

তিনি আরও বলেন, এমন নীল নকশার পরিকল্পনাকে গোপন রাখতে বর্তমান অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকার পূর্বের ফ্যাসিস্ট সরকারের মতো নিজের অপকর্ম আড়াল করতে চূড়ান্ত দমন নীতির আশ্রয় নিচ্ছে। এরই মধ্যে এই চুক্তির শর্তাবলি প্রকাশ করায় ‘বাংলা আউটলুক’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন সরকারের প্রেস উইং চাপ দিয়ে প্রত্যাহার করিয়ে নিয়েছে। জনগণ এ ধরনের পদক্ষেপ মেনে নিবে না।

সম্প্রতি এনবিআর এর উপকমিশনার মুকিতুল হাসানকে সরকারের এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ফাঁসের অভিযোগে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে যা অত্যন্ত উদবেগজনক। একজন সরকারি কর্মচারী জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। দেশের স্বার্থবিরোধী এহেন গোপন পরিকল্পনা জনগণের কাছে উন্মোচনা করা কখনোই অপরাধ হতে পারে না।

বাসদের সাধারণ সম্পাদক অবিলম্বে এই ধরণের জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ববিরোধী ও মার্কিন বশংবদ হওয়ার অধীনতামূলক চুক্তি থেকে সরকারকে সরে আসার আহ্বান জানান এবং একই সাথে তিনি বলেন, এধরনের চুক্তি করার কোনো এখতিয়ার বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। তিনি অবিলম্বে এনবিআর কর্মকর্তা মুকিতুল হাসানকে চাকরিতে পুনর্বহাল করার দাবিও জানান। একই সাথে সাম্রাজ্যবাদের সাথে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি পরিহার করা এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সকল পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

দিনাজপুর, নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলায়

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৭০তম হল দিবস পালিত

● আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই, সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন কর

● অবিলম্বে কান্তনগর তেভাগা চত্বরে সিধু-কানুর ভাস্কর্য পুনঃনির্মাণ কর

● দ্রব্যমূল্য কমাও, সিডিকেট ভাস্কো, গ্রাম-শহরের শ্রমজীবীদের আর্মি রেটে রেশন চালু কর

● জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০% কৃষিতে বরাদ্দ কর।

● ভূমিদস্যুদের কবল থেকে আদিবাসীদের জমি উদ্ধার কর, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু কর

উল্লিখিত দাবিতে 'আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা'র প্রধান স্লোগান নিয়ে

বাসদ দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৩০ জুন দিনাজপুর ইনস্টিটিউট মাঠে ১৭০তম হল বা সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ দিনাজপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক কিবরিয়া হোসেনের সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তব্য দেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজকুজ্জামান রতন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আলী রায়হান সরকার, সাংবাদিক শৈশব রাজু, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ বিমল খালকো, সদস্য বাসন্তি মুর্মু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রিনা মুর্মু।



নওগাঁ জেলা শাখার উদ্যোগে হল দিবসের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত



জয়পুরহাট জেলা শাখার উদ্যোগে হল দিবসের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

কর্নেল তাহেরের ফাঁসি দিবসে বাসদের শ্রদ্ধা

২১ জুলাই '২৫ বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল আবু তাহের (বীর উত্তম)-এর ফাঁসি দিবস স্মরণে নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলায় তার নিজ গ্রাম কাজলায় অবস্থিত কর্নেল তাহেরের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামানসহ দলের নেতৃবৃন্দ ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, কর্নেল তাহের ছিলেন সামরিক বাহিনীর ভেতর থেকে গণমানুষের পক্ষে কাজ করা একজন বিপ্লবী নেতা। স্বাধীনতার

পর তিনি চেয়েছিলেন একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে এবং দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে একটি উৎপাদন মুখী সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগেই তাকে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ফাঁসিতে বুলিয়ে হত্যা করা হয়।

তিনি আরও বলেন, কর্নেল তাহেরের স্বপ্ন ও আত্মত্যাগ আজও এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে আছে। তার সাহস, আদর্শ ও সংগ্রাম বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আমাদের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা হয়ে আছেন।



সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধা জুলাই চেতনার পরিপন্থি



গণ অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে চারণের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৮ জুলাই '২৫ ঢাকার সেগুনবাগিচাছ ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে 'জুলাই গণ অভ্যুত্থানে সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা : বর্তমান বাস্তবতা ও করণীয়' শীর্ষক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নিখিল দাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় সভায় আলোচনা করেন বাসদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড

বজলুর রশীদ ফিরোজ, চারণের সহসভাপতি শাহজাহান কবির, কবি কামরুজ্জামান ভূঁইয়া, জসিম উদ্দিন ও প্রদীপ সরকার প্রমুখ।

আলোচনাসভায় কমরেড ফিরোজ বলেন, প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ভূখণ্ডে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম, পাকিস্তানের স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা সর্বোপরি স্বাধীনতা সংগ্রামে সাংস্কৃতিক কর্মীরা তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্বাধীনতার পক্ষে মানসিক জমিন তৈরিতে অসামান্য অবদান রেখেছে।

শ্রম সংস্কার কমিশন : প্রত্যাশা ও দায়

গণ অভ্যুত্থান যেমন গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তেমনি প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা সমাধানের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়ে তুলেছিল। অভ্যুত্থানকে সফল করে তুলেছিল, শ্রমজীবীদের বিপুল অংশগ্রহণ ও জীবনদান। ফলে তাদের সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানের পথ বের করতে গঠন করা হয়েছিল শ্রম সংস্কার কমিশন। এই কমিশনের ৪৬০ পৃষ্ঠার সুপারিশগুলো যেন সরকারের কাছে নীতি, নিয়োগকারীদের কাছে বাধ্যবাধকতা এবং শ্রমিকদের জন্য দরকষাকষির দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় সেই প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ থেকেই মূল রিপোর্টের চিত্রটা অনুমান করা যাবে। যেমন—

১. শ্রম কমিশন সব শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা ও স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করেছে : দেশের ৭ কোটি ৪০ লাখ শ্রমশক্তি যারা প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহভিত্তিক, স্বনিয়োজিত ইত্যাদি বিভিন্নভাবে শ্রম দিচ্ছে তাদের জন্য রাষ্ট্র শ্রম আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। সেই লক্ষ্যে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র, নিরবচ্ছিন্ন কাজ এবং আয়ের নিশ্চয়তা, মর্যাদাপূর্ণ ও শোভন কর্মপরিবেশ, চাকরির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অস্থায়ী ও এজেন্সি নির্ভর নিয়োগের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। শ্রমিকের নিজের ও পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন উপযোগী ন্যায্য মজুরি (লিভিং ওয়েজ), উন্নয়নে ন্যায্য অংশীদারত্ব ও হিস্যা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ কাজ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, দুর্ঘটনায় যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং নিজের ও পরিবারের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার থাকতে হবে। প্রত্যেকেরই অবসর, অক্ষমতা, অসুস্থতা, মাতৃত্বকালীন সময় বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষিমে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সংগঠিত হওয়া, সমষ্টিগতভাবে প্রতিনিধিত্ব করা ও অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ জানানো, প্রতিকার ও ন্যায়বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে সরকার দেশের সংবিধান, আইএলও কনভেনশন ও কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, শোভন কাজের মানদণ্ড এবং মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার আলোকে, যথায়ত ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে বর্তমান শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় এবং মৌলিক সংস্কার অথবা একাধিক আইন প্রণয়ন করবে।

২. মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় এবং খাতভিত্তিক মজুরি নিশ্চিতকরণ : মজুরি কোনো দয়া বা করুণা নয়, শ্রমিকের শ্রমের ফলে অর্জিত অধিকার। এই বিবেচনাকে সামনে রেখে শ্রমিক ও তার পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন উপযোগী মজুরির অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হবে। একই সঙ্গে মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতি উন্নয়ন, মজুরি বোর্ডের সক্ষমতা

বৃদ্ধি ও কাঠামোগত সংস্কারে স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করার সুপারিশ করা হয়েছে। দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় রেখে জাতীয় ও খাতভিত্তিক মজুরি ৩ বছর পরপর মূল্যায়নের মাধ্যমে বৃদ্ধি এবং মর্যাদাপূর্ণ মানদণ্ড নির্ধারণের কথা বলেছে কমিশন।

৩. নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ : শ্রমিকের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে খাত ও পেশাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। অবহেলাজনিত বা কর্মপরিবেশের ঝুঁকিতে শ্রমিকের মৃত্যু ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত হাইকোর্ট নির্ধারিত কমিটির পর্যালোচনা ও আইএলও কনভেনশন বিবেচনায় নিয়ে ক্ষতিপূরণ মানদণ্ড তৈরি করতে হবে।

৪. শ্রমিকের নিবন্ধন ও তথ্যভাণ্ডার গঠন : অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, স্বনিয়োজিতসহ সব শ্রমিকদের পেশাগত ও আইনি সুরক্ষা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে রাষ্ট্র শ্রমিকের স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেবে। একটি ‘জাতীয় শ্রম তথ্যভাণ্ডার’ গড়ে তুলতে হবে।

৫. সংগঠন ও দরকষাকষি অধিকার : সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন করার বাধা অপসারণ ও দরকষাকষির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাদিহিমূলক কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।

৬. জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ : শ্রম মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগুলোর পুনর্বিন্যাস, সক্ষমতা এবং সমন্বয় জোরদারের লক্ষ্যে শ্রমিক ও শ্রম খাতসম্পর্কিত সরকারি (শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন আইআরআই, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ ইত্যাকার সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) সব প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা, গণতান্ত্রিক চর্চা, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন : জবাবদিহিমূলক শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন করতে হবে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি ‘জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম’ গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮. কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ : বেকারত্ব রোধ, দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রসারে কার্যকর উদ্যোগ রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। একই সঙ্গে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পথ নকশা তৈরি করবে।

৯. সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা : শ্রমিকের সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রাপ্তির (কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, মৃত্যু, কর্মঅক্ষমতা, অসুস্থতা-অবসর, মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থা) সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আইএলও এর জীবনচক্রভিত্তিক

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন, সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০. সম-অধিকার নিশ্চিত ও সহিংসতা ও বৈষম্য দূরীকরণ : নারী-পুরুষ, অন্যান্য লিঙ্গ, জাতি-ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীভেদে মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসহ শ্রম খাতের সর্বত্র সম-অধিকার অধিকার নিশ্চিতে কার্যক্রম গ্রহণ করবে। পাহাড়ে-সমতলে আদিবাসী ও জাতিসত্তাগুলোর শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

১১. সব ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধ : যৌন হয়রানিসহ সব ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২০০৯ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতা বিরোধী নীতিমালা, অভিযোগ সেল ও নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা। আইএলও ১৯০ কনভেনশন অনুসমর্থন করতে হবে।

১২. সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা : সব নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ৬ মাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকারও সহায়তা প্রদান করবে।

১৩. শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধ এবং নিরাপত্তা : শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪. সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক ও সামাজিক সংলাপ চর্চা : সুসমন্বিত-সৌহার্দপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে শ্রমিক-নিয়োগকারীসহ সব পক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ এবং কার্যকর সংলাপের কাঠামো ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

১৫. শ্রম আদালত, ন্যায়বিচার ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা : শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও অযথা হয়রানি বন্ধে সরকার উদ্যোগ নেবে।

১৬. মর্যাদাপূর্ণ-হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ ও আদালতে বাংলাভাষার প্রচলন করা : মর্যাদাপূর্ণ শ্রমসংস্কৃতির লক্ষ্যে শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতিভেদে অবমাননাকর ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক ভাষার ব্যবহার রোধ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে তুচ্ছার্থে তুই-তুমি সম্বোধন চর্চা বন্ধ করতে হবে। শ্রম আদালতের শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল থেকে হাইকোর্ট ও অ্যাপিলেড ডিভিশন পর্যন্ত সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন করতে হবে।

১৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বে নারী-পুরুষ শ্রমিকের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ : শ্রমসংশ্লিষ্ট নীতি ও বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ-বাস্তবায়নে নারী-পুরুষ উভয় শ্রমিক ও তার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৮. বিদ্যমান তহবিলের স্বচ্ছতা ও আপৎকালীন তহবিল গড়ে তোলা : দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, ব্যবসায় আকস্মিক সংকটের কারণে শ্রমিকের মজুরি ও উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার জরুরি ও আপৎকালীন তহবিল গঠন করবে। বিদ্যমান শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয়

তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

১৯. শ্রমিক ইতিহাস-ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা ও স্মৃতিসৌধ গঠন : শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা, স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর গঠনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যক্রমে শ্রমিকের সংগ্রাম অন্তর্ভুক্ত ও ইতিহাস সংরক্ষণ করতে হবে।

২০. শহিদ স্বীকৃতি, পুনর্বাসন ও চিকিৎসা : চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান ও শ্রমিক আন্দোলনে নিহত শ্রমিকদের রাষ্ট্র শহিদের স্বীকৃতি দেবে। শ্রম ক্ষেত্রে আহত শ্রমিকের পুনর্বাসন ও চিকিৎসায় রাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

২১. টেকসই শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন : শিল্পের বিকাশ, শিল্পায়ন ও টেকসই ও শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠা, উদ্যোক্তা গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক ও পরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠন এবং শিল্প, দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

২২. শিল্পাঞ্চল ও শ্রমঘন এলাকায় নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত : শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য শিল্পাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা ও সেবা বিশেষ করে (শিক্ষা-চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবিমা, সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির যথাযথ সরবরাহ ও অন্যান্য খাতগুলো যাতে শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত হয় তার উদ্যোগ নেওয়া, যাতে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়।

২৩. জলবায়ু ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিবেচনায় নিয়ে কর্মপরিবেশ গঠন : আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ২০৩০) অর্জন, আইএলও ডিসেন্ট ওয়ার্ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিপালন করতে হবে।

২৪. অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত : দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করে অভিবাসী শ্রমিক তাদের অভিবাসন এবং দেশে ফিরে আসার পর দেশের অর্থনীতি ও সমাজে ভূমিকা পালনের জন্য শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, শ্রমিকদের অধিকার, কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিতে রাষ্ট্র উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২৫. শ্রমবিষয়ক গবেষণা ও জরিপ : শ্রম শক্তি দেশের অন্যতম সম্পদ। ফলে এর জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার আলাদা বিভাগ গঠন করার সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন।

শ্রম সংস্কার কমিশন রিপোর্ট নিয়ে একদিকে যেমন বিপুল প্রত্যাশা রয়েছে, অন্যদিকে অনেক ভালো কথার কার্যকারিতা নেই, এই তিক্ত অভিজ্ঞতাও আছে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। সুপারিশ বাস্তবায়নে শ্রমিক সংগঠনের দাবি অব্যাহত রাখতে হবে।

‘জুলাই গণ অভ্যুত্থানে নারীর ভূমিকা ও বর্তমান বাস্তবতা’ শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

সভায় কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ পরবর্তী সকল আন্দোলনের মতোই জুলাই আন্দোলনেও নারীদের সংগ্রামী ভূমিকাকে অস্বীকার করা হচ্ছে, স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। সরকার ১৪ জুলাই ‘জুলাই উইমেন্স ডে’ ঘটা করে পালন করে কিন্তু নারীদের লড়াইয়ের স্বীকৃতি, মর্যাদা-নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে নাই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হত্যাকাণ্ডের বিচার, নিহতদের তালিকা

এবং আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে না। সরকার এখতিয়ার বহির্ভূত কাজে বেশি আগ্রহী। বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে যা বেশি সম্পর্কিত। চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল লিজ দেওয়া, রাখাইনে মানবিক করিডোর দেয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ‘রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ এগ্রিমেন্ট’ এর নামে অধীনতামূলক চুক্তির চেষ্টাসহ এরকম কাজের দিকে আগ্রহ গণ অভ্যুত্থানের চেতনা পরিপন্থি।

শম্পা বসু বলেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক

নারী সমাজকে বৈষম্যের মধ্যে রেখে সমাজের বৈষম্য দূর করা যাবে না। জুলাই আন্দোলনে যে লাখে মেয়েরা লড়াই করল, হামলা-নির্যাতনের শিকার হলো তাদের নিরাপত্তা রাষ্ট্র দিতে পারে নাই। আন্দোলনে অংশ নেয়া নেতৃত্ব পর্যায়ের প্রায় সকল নারী সাইবার বুলিংসহ নানা রকম নিপীড়নের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে। নারী-শিশু ধর্ষণ-নির্যাতন, নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক আক্রমণ বেড়েছে। যে আকাঙ্ক্ষায় নারীরা রাজপথ প্রকম্পিত করেছিল সেই নারীদের আজ আতঙ্কের মধ্যে বাইরে বের হতে হয়।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, নারী মুক্তি আন্দোলন সমাজ মুক্তির আন্দোলনের সাথে যুক্ত। এক অতিনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারী অবস্থা থেকে দেশ আজ ভীষণভাবে অনিয়ন্ত্রিত স্বৈচ্ছাচারী অবস্থায় উপনীত হয়েছে। শাসকের বদল হয়েছে কিন্তু ব্যবস্থা বহাল আছে। ক্ষমতার হাত বদলে বৈষম্যহীন বাংলাদেশের কোন রূপরেখা হাজির হয়নি। বৈষম্যের মূলে রয়েছে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা। এর উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইকে অগ্রসর করার মধ্য দিয়েই নারী মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বন্দর পরিচালনা করতে হবে ।। মানবিক করিডোর দেওয়া চলবে না

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

মানবিক করিডোর, বলা হয় ।

মূলত, জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন রেজুলেশন (৪৬/১৮২ এবং ৫৮/১১৪)-এ মানবিক নীতিকে অনুমোদন করা হয়েছিল। সংস্থাটি মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রের সব কার্যক্রম গাইড করে থাকে ।

সহায়তা বলতে—যুদ্ধ, জলবায়ু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যাদের মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত তাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তার কথা বলা হয়। তবে এই মানবিক সহায়তা অবশ্যই হতে হবে মানবিকতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায্যতার নীতি অনুসারে। আর নিরাপদ মানবিক করিডোরের অর্থের সংজ্ঞায় সংস্থাটি বলেছে—জরুরি সরবরাহের জন্য একটি প্যাসেজ। মানবিক করিডোরের মধ্য দিয়ে ত্রাণসামগ্রী মুক্তভাবে সংঘাতময় এলাকায় যেতে পারে ।

জাতিসংঘের সনদ অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্ত দেশের সম্মতিতে মানবিক সহায়তা দেওয়া উচিত। এটি হতে হবে একটি অসামরিক জোন, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সবচেয়ে বড় কথা সংঘাতে জড়িত পক্ষগুলো তাতে সম্মত হতে হবে।

আর রেডক্রস মানবিক করিডোরের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত পক্ষগুলোর সমঝোতার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুমোদন করা নিরাপদ প্যাসেজ ।

বেসামরিক নাগরিকদের সংঘাতময় এলাকা ত্যাগ করা, মানবিক সহায়তা সামগ্রী আনা

বা নেওয়া কিংবা আহত, অসুস্থ বা নিহতদের সরানোর জন্য এটি ব্যবহার করার অনুমোদন তারা দিতে পারে। গত কয়েক দশকে মানবিক করিডোর লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা করেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষগুলোকে রাজি করাতে না পারলে জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অনেক সময় এমন প্যাসেজ বানায়, যেখানে বিবদমান সব পক্ষকে সরিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা দেয়া হয়।

মানবিক করিডোর বা প্যাসেজের

অভিজ্ঞতা কী বলে?

যেসব দেশে মানবিক করিডোর পরিচালিত হয়েছে এমন অনেক জায়গাতেই অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি। অনেক জায়গায় নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছে। শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন হয়নি এমন জায়গায় বিবাদমান কোনো কোনো পক্ষ এই প্যাসেজে আক্রমণ করার নজির আছে। এমনকি অনেক জায়গায় মানবিক করিডোরে হামলায় সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আবার কোনো জায়গায় এমন করিডোরে থাকা সেতু উড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। গাজার জন্য খোলা করিডোরেও হামলা চলছে, যা মানবিক সহায়তার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করেছে।

অনেক ক্ষেত্রে এমন করিডোরের রাজনৈতিক ও সামরিক অপব্যবহারের ঝুঁকি থাকে। আবার অস্ত্র পাচার এবং দখলকরা এলাকায় জ্বালানি চোরাচালানের জন্যও এই করিডোর ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ফলে এ ধরনের করিডোরের উদ্দেশ্য

পরিস্কারভাবে চিহ্নিত থাকা উচিত। অর্থাৎ এটা কী ত্রাণসামগ্রী বা জরুরি সহায়তার জন্য, নাকি বেসামরিক নাগরিকদের সংঘাতময় এলাকা ত্যাগের জন্য, নাকি উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে সেটার পরিস্কার ঘোষণা থাকা উচিত। করিডরটি হতে হবে নিরাপদ, প্রবেশযোগ্য ও কার্যকর। সব পক্ষের মধ্যেই বিস্তারিত সমঝোতা হতে হবে।

যুদ্ধরত অঞ্চলে মানবিক করিডোর

শেষে সামরিক করিডোরে পরিণত হয়

বিশ্বে যুদ্ধ চলমান যেসব জায়গায় মানবিক করিডোর করা হয়েছে, সেগুলোকে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র মানবিক করিডোরে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এর সঙ্গে সামরিক নানা বিষয় যুক্ত হয়ে পড়েছে। যেমন, ১৯৮৯ সালে আজারবাইজান–আর্মেনিয়া যুদ্ধে লাচিন করিডোর, ১৯৯৫ সালে বসনিয়া–হারজেগভিনার সেব্রেনিতসা করিডোরে গণহত্যা, ২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে নো ফ্লাই জোন সত্ত্বেও হত্যা, কঙ্গোতে ২০০৮ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গোমা করিডোর কোনটাই শেষ পর্যন্ত মানবিক থাকেনি।

মায়ানমারে যুদ্ধ চলছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ এখন রাখাইনে মানবিক সহায়তার জন্য করিডোর দিলেও তাতে আদৌ রাখাইনের বেসামরিক নাগরিকদের লাভ হবে কি-না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এর নিয়ন্ত্রণ কার হাতে যাবে সে নিশ্চয়তা কী? বরং বাংলাদেশের করিডোর দিয়ে যাওয়া সহায়তা আরাকান আর্মির হাতে নাকি মায়ানমার সামরিক জা্ভার হাতে পড়বে তার নিশ্চয়তা কি?

জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০% কৃষি খাতে বরাদ্দের দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভুগছে। তাদের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্যসুবিধা ও চিকিৎসার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। স্বাস্থ্যসেবার অভাবে রোগব্যাধিতে জর্জরিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। বজ্রপাতে প্রতিবছর অসংখ্য প্রাণহানি ঘটছে মাঠে কাজ করতে যাওয়া কৃষকের। বন্যা-খরা, বাড়়-অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসলের ক্ষতি পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম নেই বললেই চলে। কৃষকের জন্য সেচ সংকট ও জলাবদ্ধতা একটা নিয়মিত ভয়াবহ সমস্যা। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যহত হয়।

কৃষিভিত্তিক নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে না। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ৭৮টি পাটকল এবং ১৫টি চিনিকল রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল। কিন্তু অতীতের সরকারগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির কারণে একের পর এক কারখানা বন্ধ ও ব্যক্তি মালিকের হাতে তুলে দেয়। সর্বশেষ আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার ৬টি চিনিকল ২৬টি পাটকল একসাথে বন্ধ করে দেয়। আমরা মনেকরি কৃষিভিত্তির শিল্প গড়ে ওঠলে কৃষি যেমন রক্ষা পাবে, তেমনি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা

সমাধানের পথ খুলে যাবে। তাই দেশের কৃষি, কৃষক-খেতমজুর, আদিবাসী তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে কৃষি খাতে ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা জরুরি। আসন্ন বাজেটকে সামনে রেখে আমরা নিম্নোক্ত দাবি জানাচ্ছি।

১. জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বাজেটের ৪০ % কৃষি খাতে বরাদ্দ করতে হবে

২. কৃষি শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড, রেশন ও স্বাস্থ্যসুবিধা নিশ্চিত করতে হবে; ভূমিহীন, খেতমজুর ও বর্গাচাষিদের কৃষি কার্ড দিতে হবে

৩. কৃষি শ্রমিকদের সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা এবং ১২০ দিনের কর্মসূজন প্রকল্প চালু; ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস; ন্যূনতম মজুরি ৮০০ টাকা নির্ধারণ; পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে কাজের এলাকায় থাকার জন্য মানসম্মত নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বড় পাথার, হাওর এলাকায় সরকারি উদ্যোগে বিসুদ্ব খাবার পানি ও টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে

৪. নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য দূর; ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এমবিবিএস ডাক্তার, ১০ শয্যার হাসপাতাল, পর্যাপ্ত ওষুধ ও সিজার

সুবিধাসহ মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে
৫. বিএডিসিকে সচল করে, সার-বীজ, কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণ ন্যায্যমূল্যে, যথাসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে; ভেজাল বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে; ভেজাল বীজ, সার, কীটনাশকের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে হবে।

৬. কৃষি ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করতে প্রতিটি ইউনিয়নে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খুলে খোদ কৃষকের কাছ থেকে কৃষি ফসল ক্রয় করতে হবে। চলতি মৌসুমে কমপক্ষে ৫০ লাখ টন ধান খোদ কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করতে হবে

৭ বন্যা-খরা, নদীভাঙনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও খেতমজুরদের আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সরকারি খাসজমি সমবায়ের মাধ্যমে ভূমিহীন খেতমজুরদের মধ্যে বিতরণ (হস্তান্তর অযোগ্য) করতে হবে; সকল ভূমিহীন-গৃহহীনদের জন্য সরকারি আবাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৯. দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদ ও আসলসহ মওকুফ করতে হবে। বিনা সুদে কৃ

মানবিক করিডোরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত সরকার নিচ্ছে অথচ দেশের মানুষ, রাজনীতিক ও প্রশাসনের কেউ কিছু জানে না। এসব সিদ্ধান্ত কোথায় হচ্ছে, কে নিচ্ছে, কোন প্রক্রিয়ার নিচ্ছে, শর্ত কী, কী হবে? কেউ জানে না। সবাইকে অন্ধকারে রেখে এত বড় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে কেন? এ নিয়ে জনমনে হাজারো প্রশ্ন। ভূরাজনীতিতে এই অঞ্চলের উপর নজর সকল সাম্রাজ্যবাদী বড় শক্তিগুলোর। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কার পক্ষে এবং কী ভূমিকা, কীভাবে পালন করবে? যদি মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক সব পক্ষ একমতও হয়, তাহলে এই করিডোরে বাংলাদেশের স্বার্থ কী, ঝুঁকি কী? মায়ানমারের সাথে চীন-লাওস, থাইল্যান্ড-ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়া তাদের কারও কোন মানবিক দায়িত্ব কী নেই? বরং মানবিক সামরিক যে করিডোরই হোক না কেন তাতে মায়ানমারের সংঘাত আরও জটিল রূপ নেবে, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাवासন বন্ধ করার অজুহাত তৈরি হবে আর চীন, ভারত, আমেরিকা, রাশিয়ার স্বার্থ সংঘাতের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হবে। মানবিকতার আড়ালে এই ঝুঁকিতে বাংলাদেশ কেন পড়তে যাবে? ফলে তথাকথিত মানবিক করিডোরের নামে সামরিক ফাঁদে পড়ার চক্রান্ত রুখে দাঁড়াতেই হবে।

সমাপনী সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার যদি তার পরিকল্পনা থেকে সরে না আসে, দেশকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে, তা হলে এদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবে।

বাংলাদেশের মানচিত্রে করিডোরের অবস্থান

বাংলাদেশের মানচিত্রে করিডোরের অবস্থান

বাংলাদেশের মানচিত্রে করিডোরের অবস্থান

যি ঋণ দিতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করতে হবে

১১. চাল, ডাল, তেল-চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে; সিডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে

১২. ব্যাংক-সেটেলমেন্ট, তহশিল ও ভূমি অফিসসহ সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে ঘুষ-দুর্নীতি ও দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে

১৩. আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমি ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে

১৪. তিস্তাসহ অভিন্ন ৫৪টি নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। নদী খাল দখল ও দূষণমুক্ত করে দখলদার ও দূষণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের পেশকৃত দাবিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে কৃষি খাতে উন্নয়ন বাজেটের ৪০% এবং সামাজিক সুরক্ষাখাতসহ উৎপাদনমুখী জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে গণ অভ্যুত্থানের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবেন।

জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার, প্রয়োজনীয় সংস্কার, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার দাবি

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

লুটপাট-দুর্নীতি, গুম-খুন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ, কর্তৃত্ববাদ ও ষ্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। মানুষ চেয়েছিল এসব থেকে মুক্ত একটা সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু বছর না পেরোতেই মানুষের সেই আশা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে।

জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারকেও এখনও দৃশ্যমান করা যায়নি। বরং সুনির্দিষ্ট অভিযোগে মামলা না দিয়ে গড়পড়তা অভিযোগে ঢালাও মামলা দায়েরের মাধ্যমে মামলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে

দুর্বল করা হচ্ছে যা খুনিদের ভবিষ্যতে রক্ষা করতে সহায়ক হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন,

মুক্তিযুদ্ধকে হেয় করা এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ধ্বংস করার ঘটনা ঘটে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধ এই জাতির সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যুদ্ধাপরাধী শক্তিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হচ্ছে, জুলাই অভ্যুত্থানের আন্দোলনের চেতনার সাথে যা সাংঘর্ষিক।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের কিংবা আদিবাসী, দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা নেই। অর্থাৎ শুধু রাষ্ট্রের

উপরিকাঠামোতে পরিবর্তন করে কোন কার্যকর পরিবর্তন আনা যাবে না।

একই সাথে পূর্ববর্তী হাসিনা সরকারের মতো এই সরকারের নানা কুশীলবদের বিরুদ্ধেও শত শত কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ আসছে। ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বিশেষ রাজনৈতিক দলকে তোষণ ইত্যাদি নানা কিছু ঘটিয়ে এরা জুলাই অভ্যুত্থানের মূল চেতনার বিপরীতে হাঁটা গুরু করেছেন বলে মন্তব্য করেন নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ সরকারের এক বছরের কাজের শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান।

^[1] মানবিক করিডোর, বলা হয় ।

^[2] মূলত, জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন রেজুলেশন (৪৬/১৮২ এবং ৫৮/১১৪)-এ মানবিক নীতিকে অনুমোদন করা হয়েছিল

রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সরকারি
তোলারাম কলেজ শাখা

‘মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধর, নিজেরে করো জয়’, এই স্লোগানকে সামনে রেখে ছাত্র ফ্রন্ট সরকারি তোলারাম কলেজ শাখার পক্ষ থেকে ২৯ মে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলেজের পদ্মা মিলনায়তনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কারবিতরণী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র ফ্রন্ট তোলারাম কলেজের সংগঠক ইফতি আহমেদ জিহাদের সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন তোলারাম কলেজের অধ্যক্ষ বিমল চন্দ্র দাস, দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বদরুন্নাহার, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ে, অর্থ সম্পাদক সুলতানা আক্তার ও জেলা আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। আয়োজন শেষে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের অন্যতম

প্রধান সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিভাবান সৃজনশীল কবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা-গান, উপন্যাস-নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ-চিত্রকলা রচনা করেন। সাহিত্যের উৎকর্ষতায় বিপুল অবদান রাখায় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি। তাঁর সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা, সমাজের বাস্তবতা, মানবিক বেদনা, প্রেম-প্রকৃতি, স্বদেশচেতনা ওঠে আসে। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত-প্রকৃতি, রোম্যান্টিকতা, প্রেম ও দার্শনিক গভীরতা; আধুনিকতা, বৈষ্ণব পদাবলি, বাউল দর্শন, উপনিষদের চিন্তা তার সাহিত্যে প্রকাশ পায়। তার উপন্যাসের মধ্যে সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক, জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম, কাব্যিক রোম্যান্স, স্বদেশী আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবের বিষয় তুলে ধরেন। তাঁর রচিত ‘আমার সোনার বাংলা (বাংলাদেশ), জনগণমন (ভারত), শ্রীলঙ্কা মাতা (অনুপ্রাণিত) জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির কেন্দ্রে-মানুষের মুক্তি ও সৌন্দর্যের অন্বেষণ। তার রচনা আজও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য উজ্জ্বল প্রতিভা।



তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি কবিতা বা গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা বিস্তৃত ছিল উপন্যাস-গল্প, নাটক-প্রবন্ধ এবং সাংবাদিকতায়। তিনি ছিলেন অন্যান্য ও অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, বিশ্বাস করতেন সাম্যবাদী দর্শনে এবং মানবতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রেরণা। উদার-অসাম্প্রদায়িক, হিন্দু-মুসলমানে তিনি কোনো ভেদ করেননি। রেনেসাঁসের যুগের ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীমুক্তি, ধর্মীয় সংস্কার প্রভৃতি বিপ্লবাত্মক চিন্তার স্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন সামন্ততান্ত্রিক কুপমণ্ডলতার প্রাচীরকে ভেঙে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, নজরুলের সংগীত রচনা বৈচিত্র্য অনন্য। তিনি গীতিকার ও সুরকার। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় চার

হাজারেরও বেশি। তিনি দেশাত্মবোধক গান, প্রেমের গান, ইসলামি গজল, শ্যামা সংগীত, ভক্তিগীতি রচনা করেছেন। সব কিছু ছাপিয়ে তিনি পরিচিত হন বিপ্লব, বিদ্রোহের গান ও কবিতার স্রষ্টা হিসেবে। তিনি বলেছেন, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না/ অত্যাচারীর খড়গ-কৃপাণ ভীম রণ, ভূমে রণিবে না-বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত। উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল সেদিন থামেনি আজও থামেনি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এই দুই কবির সৃষ্টিকর্ম আজও আমাদের অন্যান্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং সাম্যের সমাজ গড়তে প্রেরণা জোগায়।



সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ লুট হওয়া ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দাবি

বাম গণতান্ত্রিক জোটের বিক্ষোভ
সমাবেশে নেতৃবৃন্দ

১৩ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জোটের নেতৃবৃন্দ বলেন, অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। খুন-সন্ত্রাস, ধর্ষণ-চাঁদাবাজি, মব একের পর এক চলতে থাকলেও সরকার কার্যকর কোন

ব্যবস্থা নিতে পারছে না। এভাবে চলতে থাকলে মানুষ আবার নিজেদের বাঁচার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রকাশ্য দিবালোকে মিডফোর্ট হাসপাতালের সামনে ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হয়। খুলনায় গুলি করে হত্যার পর পায়ের রগ কেটে দেওয়া হয়েছে, চাঁদপুরে মসজিদের ভেতর মুয়াজ্জিনকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা হয়েছে। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইরানে হামলা ও ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে বাসদের বিক্ষোভ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মদদে আন্তর্জাতিক আইন-নিয়মনিতি লঙ্ঘন ও বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে, এমনকি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)র সতর্কতার পরও ইরানে ইসরায়েলের হামলা এবং ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর উদ্যোগে ২১ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৩ জুন ভোরে ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প, ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনকেন্দ্র, আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, সামরিক কর্মকর্তাদের আবাসস্থলসহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক হামলা চালায়। ‘অপারেশন রাইজিং লায়ন’ নামের এই হামলায় ইরানের কয়েক শ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। হামলায় ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ, ইরান বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ডার, পরমাণবিক বিজ্ঞানীসহ অনেক শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা নিহত হন। তারা ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনিকে হত্যার ঘোষণা দিয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী হামলার পরিকল্পনায় তেহরান খালি করার জন্য ট্রাম্পের ঘোষণা সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে হতবাক করেছে, যুদ্ধের ভীতি ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

আমেরিকা, ইসরায়েলসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ দাবি করে আসছে যে, ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন হুমকির; বিশেষত, ইজরায়েলের অস্তিত্বের জন্য। তাই যত দিন এই হুমকি থাকবে তত দিন হামলা চলবে। সারা বিশ্ব দেখছে ইসরায়েল প্রায় দুই বছর ধরে ফিলিস্তিনে



নির্মম গণহত্যা চালাচ্ছে। শুধু তাই নয় ইসরায়েল এই সময়ে হামলা করছে সিরিয়া ও ইয়েমেনেও। এদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অর্থাৎ গোটা বিশ্বজুড়ে এক যুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে বলে মন্তব্য করেন নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা অর্জনের অভিযোগে এর আগেও ইসরায়েল ইরানে নানাভাবে হামলা চালিয়েছে। ইরানে সাইবার হামলা চালিয়েছে, পরমাণু বিজ্ঞানীদের গুপ্তহত্যা করেছে, গুপ্ত অভিযান পরিচালনা করেছে এবং ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। ইজরায়েল তার গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে (সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্পেশাল অপারেশনস) ব্যবহার করে ইরানের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ,

গোয়েন্দা বিশ্লেষণ এবং গোপন অভিযানের সাথে জড়িত। এই বাহিনীর ইরানে তৎপরতার কথা ইসরায়েল স্বীকার করেছে এবং ১৩ জুনের ইরানের টার্গেট কিলিং এর পরিকল্পনায় এরা নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত কয়েক দশকে ইজ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীশক্তি ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্র থাকার মিথ্যা অভিযোগ এনে একযোগে সে দেশে আক্রমণ করে লাখ-লাখ সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে। দেশটিকে ধ্বংস করে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। কিন্তু পরে তাদের এসব অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। লিবিয়াতেও একই মিথ্যার চার করে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফিকে হত্যা করেছে। আফগানিস্তানে একই কাজ

করেছে। নানা অভিযোগ তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দেশটির অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে এখন যুদ্ধের মাধ্যমে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়।

অবিলম্বে ইরানে হামলা বন্ধের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন ও ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবি জানান। ফিলিস্তিনের একদিকে গুলি করে, বোমা মেরে মানুষ হত্যা করছে অন্য দিকে সেখানে ত্রাণ সরবরাহ বন্ধ করে অনাহারে মানুষ মারাচ্ছে। এর মধ্যে সীমিত পরিসরে যে ত্রাণ সরবরাহ চলছে সেখানে ত্রাণ নিতে আসা মানুষকে গুলি করে হত্যা করছে। নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদী ও জায়েনবাদী ইসরায়েলি ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে বিশ্বের দেশে দেশে গণতান্ত্রিকী মানুষের প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই সাথে ইরানে যুদ্ধবিরোধী লড়াই জনগণের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলফিকার আলী, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামে সদস্য আহসান হাবিব বুলবুল, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাউড়ে। সমাবেশ পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামে সদস্য খালেদুজ্জামান লিপন। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

বিদ্বেষ-বৈষম্য নয়; মানবিক মর্যাদা, সমানাধিকার ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

আশা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুক্তা বাউড়ি। সমাবেশ পরিচালনা করেছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দিলরুবা নূরী

সমাবশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এক অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনা দেশ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। এই জুলাই-আগস্ট গণ অভ্যুত্থানে নারীদের বীরোচিত ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীরাও সমস্ত অচলায়তন ভেঙে রাজপথে বের হয়ে আসে। সে সময় তারা রাতের অন্ধকারে আলোর মতো জ্বলে উঠেছিল। জাতি-ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গসহ সকল ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্তির স্বপ্নে শ্রমিক-কৃষক ছাত্র-নারী, জনতা সকলে গণ অভ্যুত্থানে शामिल হয়েছিল। কিন্তু অভ্যুত্থানের পর থেকেই নারীকে উপেক্ষা করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। তাদের ভূমিকাকে অস্বীকার করে উলটে তাদের ওপর নানা নিপীড়ন শুরু হয়েছে। নারীর বিকাশের ক্ষেত্রে যে সকল বাধা সমাজে আছে সেগুলো দূর করার উদ্যোগ নেয়া হলো না। বরং তাকে নানা রকম নিপীড়ন নির্যাতনের মাধ্যমে ক্রমেই অমর্যাদাকর পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নানামুখী অপতৎপরতায় নারীদের মর্যাদাবোধে আঘাত হানা হচ্ছে। কখনো

ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারা কখনওবা ‘তৌহিদ জনতার’ নামে মব ভায়োলেন্সের মাধ্যমে। এসব ঘটনার সাথে জড়িত কাউকেই কোন শাস্তির আওতায় আনা হয়নি। নারী সংস্কার কমিশনের দেওয়া সুপারিশের প্রেক্ষিতে দেশে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করল হেফাজতে ইসলামসহ ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলগুলো। সুপারিশ বাতিলের সাথে সাথে পুরো কমিশন বাতিলের কথাও উচ্চারিত হলো। অন্য কমিশনগুলোর সকল বক্তব্যের সাথে সবাই একমত বিষয়টা এমন না কিন্তু সেগুলোর ক্ষেত্রে আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলল। কিন্তু নারী কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করে নারীদের গালিগালাজ করা হলো, টিএসসিতে নারী প্রতিকৃতি বানিয়ে তাকে অপমান করা হলো। রাষ্ট্র নির্বিকার ভূমিকায় থাকলো।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নারীর সমাধিকার এখন সময়ের দাবি। সমাজ ও পরিবারে মানুষের ভূমিকা বদলেছে, সামাজিক বাস্তবতায় নারী-পুরুষ কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করছে, পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব পালন করছে। এই পরিবর্তনের সাথে মিলিয়েই তো আইন এগিয়ে চলবে। এটাই গণতান্ত্রিক চিন্তা। কিন্তু ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী গণতন্ত্রের তোয়াক্কা করে না। তাই তারা নারীর এই অগ্রসর অবস্থানকে মেনে নিতে চান না, তারা

নারীকে গৃহবন্দি এবং পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবে রাখতে চান। তাই তারা সমাধিকারের বিরোধিতা করেন এবং ধর্ম গেল গেল রব তোলেন।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কর্মরত বিশাল অংশের নারীরা মজুরি বৈষম্যের শিকার হন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষের অর্ধেক মজুরি তাদের দেয়া হয়। গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি নেই। গৃহ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত শ্রমিকের আইনি স্বীকৃতি নেই, নারী শিশুর প্রতি অব্যাহত নির্যাতন চলছে, নারী সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। নারীর মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করে তার বিকাশের পথ সুগম করার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের অগ্রগতি সম্ভব। এছাড়া সমাজ পশ্চাদপদ অবস্থানেই থেকে যাবে।

দাবিসমূহ :

১. সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সমানাধিকারসহ ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু কর

২. সকল ক্ষেত্রে, সকল স্তরে সমকাজে সমমজুরি বাস্তবায়ন কর

৩. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যা ধর্ষণ বন্ধ কর

৪. বাল্যবিবাহের বিশেষ বিধান (১৯ নং ধারা) বাতিলসহ বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নাও

৫. গৃহস্থালি কাজের আর্থিক মূল্য রাষ্ট্রীয়ভাবে

ছাত্র-জনতার আকাজক্ষার পথে হাঁটছে কী বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

সঞ্চালনায় সেমিনারে আলোচনা করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, আমাদের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সিদ্দুল মুনা হাসান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সুমিত্রা মরিয়ম। সেমিনারের শুরুতে ধারণাপত্র পাঠ করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক

সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ।

সেমিনারে আলোচকবৃন্দ বলেন, ’৭১-এর আকাজক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি বলেই ’৯০ ও পরবর্তীতে ’২৪-এর গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। গণ অভ্যুত্থান ব্যবস্থা বদলের লড়াই ছিলো না এতে করে জনতার শক্তি ক্ষমতায় আসে নাই। অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকার মানুষের আকাজক্ষা বাস্তবায়নের দিকে হাঁটছে না। ছাত্রদের বড় অংশের অংশগ্রহণে জুলাই আন্দোলন সংঘটিত হলেও ছাত্রদের শিক্ষার সংস্কার নিয়ে কোনো

আলোচনা নাই এবং এই লক্ষ্যে কোনো কমিশনও গঠন করা হয়নি। গত ৫৩ বছরের বুর্জোয়া সরকারগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশ পরিচালনা করার কারণে যে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার গড়ে ওঠেছিল তা থেকে মুক্তির জন্যই এই গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে সে আকাজক্ষা অধরাই থেকে যাবে। তাই এই ফ্যাসিস্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে সমূলে উপড়ে ফেলাই বর্তমান সময়ের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিরুপণ কর এবং স্বীকৃতি দাও

৬. গৃহশ্রমিকদের শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত কর

৭. সিডও সনদের দুইটি ধারা সংরক্ষণ তুলে নাও এবং সিডও সনদ বাস্তবায়ন কর

৮. সাম্প্রদায়িক আক্রমণসহ সকল নারী বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ কর

৯. মব ভায়োলেন্স ও সাইবার বুলিং বন্ধ কর

১০. আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পাহাড়ে-সমতলে আদিবাসী নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা নিশ্চিত কর, নিরাপত্তা দাও

১১. সংরক্ষিত নারী আসন ১০০ চাই, প্রত্যক্ষ ভোট চাই। নির্বাচনে কালোটাকা, সাম্প্রদায়িকতা ও পেশি শক্তির ব্যবহার বন্ধ কর

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে রাষ্ট্রকে নারী নির্যাতন-ধর্ষণ বন্ধ এবং নারী বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড, ধর্মান্ধ মৌলবাদীগোষ্ঠী দ্বারা নারীর প্রতি অবমাননা বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে উপরোক্ত সকল দাবি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। একই সাথে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে রাখাইনে করিডোর, চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের হাত তুলে অশুভ চক্রান্ত করছে। ফলে অন্তর্বর্তী সরকার যথ াযথ দায়িত্ব পালন না করায় সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। তাই নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপড ঘোষণা করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

গণ অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বাসদের গণসমাবেশ ৯ অন্তর্বর্তী সরকার গণ অভ্যুত্থানের চেতনার বিপরীতে হাঁটছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

নগরের সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাউড়ি। সমাবেশ পরিচালনা করেন সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়ে পল্টন, নূরহোসেন স্কোয়ার, গোলাপ শাহ মাজার, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, বায়তুল মোকাররম হয়ে পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়।

গণসমাবেশে বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-শ্রমিক, জনতার রাজপথে জীবনবাজি রেখে লড়াই ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটে। বৈষম্যমূলক সমাজের আকাজক্ষাকে ধারণ করে প্রায় দেড় হাজার শহিদি আত্মদানে গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হলো। কিন্তু ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটাতে পারলেও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে ১ বছর পূর্তিতে এসে আমরা দেখছি বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটতে চলেছে। শহিদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গণ অভ্যুত্থানের চেতনার বিপরীতে হাঁটছে। এখও গণহত্যাকারীদের বিচারে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। নিহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকাও হয়নি। আহতদের চিকিৎসা ও নিহত-আহতদের পরিবারের পুনর্বাসন হয়নি। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নিম্নআয়ের মানুষ দিশেহারা। নতুন কর্মসংস্থান তো হয়নি, বরঞ্চ শতাধিক কারখানা বন্ধ হয়ে নতুন নতুন বেকার হচ্ছে। আমেরিকার পাণ্টা গুন্ধ আরোপে গার্মেন্টস-এ ৩৬.৫% ট্যাক্স দিতে হবে। এতে পোশাক শিল্প ঝুঁকিতে

পড়বে, বেকারের সংখ্যা আরও বাড়বে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা হয়নি। দাবি চেয়ে গুলি খেয়ে মরলো শ্রমিক। খেলাপি ঋণ ১ বছরে ৩ লাখ ১৯ হাজার কোটি বেড়ে হয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। সারাদেশে চাঁদাবাজি, তোলাবাজি, মব সৃষ্টি করে হামলা ও হত্যা, নারীর সাথে অসম্মানজনক আচরণ, মোরাল পুলিশিং, ধর্ষণ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, মাজার-বাউল আখড়া ভাঙা, নারীদের ফুটবল খেলায় বাধা, পত্রিকা-টিভিসহ প্রতিষ্ঠান-স্থাপনা দখল, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য ভাঙচুর, দুনীতি-লুটপাট ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। সরকারের প্রশ্নয়ে থাকায় অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে না। সরকারের পক্ষ থেকে মব সন্ত্রাসীদের প্রশ্নয় দেওয়া হচ্ছে। ফলে দ্বিগুণ উৎসাহে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ’৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধকে খাটো করে ’৪৭ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে মহলবিশেষ নানা কৌশল অবলম্বন করছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত ’৭২ এর সংবিধানের চার মূলনীতি বাতিলের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। নতুন বন্দোবস্তের নামে নব্য ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনকে প্রলম্বিত করে সরকারের মেয়াদ দীর্ঘায়িত করার জন্য ছলচাতুরির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। অথচ নারী আসন ১০০ তে উন্নীত করে সরাসরি নির্বাচন এবং মৌলিক অধিকারসমূহ আইনের মাধ্যমে বলবৎ করার উদ্যোগ নাই।

তিনি বলেন, সরকারের প্রধান কাজ বিচার

দৃশ্যমান ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচনের আয়োজন করা। কিন্তু ১ বছরেও বিচারের দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়া, রাখাইনে করিডোর প্রদান, তুরস্ককে অস্ত্র তৈরির কারখানা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া ও স্টারলিংকের সাথে চুক্তি করায় জনগণের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধছে। মানুষ ভাবছে ভারতীয়-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বলয় থেকে কি দেশ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বলয়ে চলে যাচ্ছে। আর নির্বাচনের দাবি করলে কারো কারো গায়ে জ্বর এসে যাচ্ছে এবং ফ্যাসিবাদের দোসর ট্যাগ দেওয়া হচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন নির্বাচন ছাড়া নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ কি? নির্বাচন না দিয়ে ইউনুস সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কীভাবে? ক্ষমতা পরিবর্তনের ৩টি পথ আছে ১. নির্বাচন ২. গণঅভ্যুত্থান ৩. সামরিক ক্যুদেতা। আমরা তাই নির্বাচন চাই।

তিনি বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার মুক্তির জনযুদ্ধকে দলীয়করণ করে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, অনেকে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করতেন। আজ এক বছর পরে জুলাই যোদ্ধাদের কর্মকাণ্ডে অনেকে জুলাই যোদ্ধা পরিচয় দিতেও বিব্রত বোধ করছেন যা জাতির জন্য লজ্জার। দেশবাসী ’৭১ এবং ’২৪ এর চেতনা বাণিজ্যের কবল থেকে মুক্তি চায়।

তিনি বলেন, গণ অভ্যুত্থানের আকাজক্ষা থেকে দৃষ্টি সরাতে স্বাধীনতা, সেকেন্ডে রিপাবলিক, নতুন সংবিধান নানা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে ছাত্রদের

নতুন দলসহ কোন কোন মহল থেকে। প্রশ্ন হলো, একটা দেশ কয়বার স্বাধীন হয়? তাহলে ’৭১ সালে কি আমরা স্বাধীন হইনি? ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জনযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন হয়ে রিপাবলিক গঠন করেছি। এবার কোন উপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে আমরা দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়ে সেকেন্ড রিপাবলিক গঠন করতে চাইছি? বিদ্যমান ’৭২-এর সংবিধানে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে তা দূর করা জরুরি। তার জন্য যা যা সংশোধন দরকার তা করতে হবে। কিন্তু যারা নতুন সংবিধানের কথা বলছেন তারা একদিকে ঐকমত্য কমিশনে গিয়ে সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব দিচ্ছেন, অন্যদিকে মাঠে বক্তৃতায় নতুন সংবিধান চাইছেন এটা নির্জলা দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। জনগণ দ্বিচারিতামূলক আচরণ মেনে নিবে না।

বক্তব্যে তিনি আমেরিকা-ভারতসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে সম্পাদিত গোপনচুক্তি প্রকাশ ও অসমচুক্তি বাতিল এবং জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার দৃশ্যমান করা, প্রয়োজনীয় সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

তিনি সকল বাম-প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন, ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নব্য ফ্যাসিবাদী প্রবণতা এবং মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখে দাঁড়ানো এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা ও ’২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের আকাজক্ষায় বৈষম্যহীন সমাজ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জারি রাখার আহ্বান জানান।

গণ অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বাসদের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত

অন্তর্বর্তী সরকার গণ অভ্যুত্থানের চেতনার বিপরীতে হাঁটছে

‘২৪-এর ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ৫ আগস্ট ‘২৫ সন্ধ্যা ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক

কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জুলফিকার আলী, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক কমরেড আহসান হাবিব বুলবুল, ব্যাটারি রিকশা-ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি খালেদুজ্জামান লিপন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের ঢাকা এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১



বিদ্বেষ-বৈষম্য নয়; মানবিক মর্যাদা, সমানাধিকার ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবি



মহিলা ফোরামের উদ্যোগে
প্রতিবাদী নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিদ্বেষ-বৈষম্য নয়; চাই মানবিক মর্যাদা ও সমানাধিকার এবং ঘরে-বাইরে, গণপরিবহনে, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে ২৪ মে জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে বিকাল ৪টায় প্রতিবাদী নারী সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে

সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. স্নিগ্ধা রেজওয়ানা, মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ডাক্তার মনীষা চক্রবর্তী, দপ্তর সম্পাদক রুখশানা আফরোজ এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০% কৃষি খাতে বরাদ্দের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের স্মারকলিপি প্রদান

জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০% কৃষি খাতে বরাদ্দের দাবিতে ২২ মে ‘২৫ সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও অর্থ উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস, সহসভাপতি জয়নাল আবেদীন মুকুল, শফিউর রহমান শফি, এডভোকেট সাইফুল ইসলাম পল্টু, এডভোকেট আসাদুল ইসলাম, রবিউল টুডু, দেবানীষ রায়, আদিবাসী নেতা আশানি তিরিকি। সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক নিখিল দাস।

স্মারকলিপির বক্তব্যে বলা হয়—

ছাত্র-শ্রমিক, জনতার ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেট। সারা দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মতোই দেশের কৃষক-খেতমজুর, আদিবাসীসহ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে বাজেটের দিকে, যে এবার কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়বে।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। নানা সমস্যা-সংকট, সীমাবদ্ধতা ও স্বাধীনতাহারা প্রতিটি সরকারের চরম অবহেলা ও উপেক্ষার পরেও জিডিপিতে কৃষির অবদান ১১.৫%। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৪% কৃষিতে নিয়োজিত। একক খাত হিসেবে এটি সর্ববৃহৎ।

গত ৫৩ বছরের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশে কৃষি খাতে বরাদ্দ ক্রমাগত



কমছে। ১৯৭২ সালে মোট ৭৮৬ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের প্রায় ২০ থেকে ২৫% বরাদ্দ করা হয়েছিল। আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ২৭ হাজার ২১৪ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৩.৮%। আমরা সকলেই জানি বাজেট শুধুমাত্র সরকারের বা রাষ্ট্রের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী মাত্র নয়। বাজেটের মধ্য দিয়ে একটি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে।

সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও কৃষিখাত এখন শিল্পপণ্য উৎপাদন ও পরিষেবা খাতের মতো পুঁজি ও শ্রমিক নির্ভর হয়ে পড়েছে। ফলে, কৃষি এবং কৃষি শ্রমিকদের উন্নয়ন

ছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়ন অসম্ভব। অপ্রতুল বরাদ্দ, বিএডিসিকে ধ্বংস করে মুনাফাখোর ব্যবসায়ী-কোম্পানি, এনজিওদের হাতে বিজ-কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষি উপকরণের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ভেজাল সার, বিজ-কীটনাশকে বাজার সয়লাব হলেও দেখার কেউ নেই। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক। বেশি দামে কৃষি উপকরণ কিনে কৃষক যে ফসল ফলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচও উঠে না। ফলে, প্রতি বছর কমপক্ষে ১১ লাখ গরিব-মার্মারি কৃষক জমি হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। আবার ক্ষেতমজুরদের বছরে ১৮০ দিনের বেশি কাজ

থাকে না। বাকি সময় হয় বেকার অথবা গ্রাম থেকে স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে শহরে এসে অন্য পেশায় যেতে বাধ্য হয়।

কৃষকদের সামাজিক সুরক্ষা বলতে কিছু নেই। যৌবনে যে কৃষক-খেতমজুর উৎপাদনের চাকা সচল রেখে দেশকে সমৃদ্ধ করে, প্রবৃদ্ধি বাড়ায়, দেশের মানুষের মুখে আহার তুলে দেয়, বৃদ্ধ বয়সে তাকে নির্ভর করতে হয় সন্তানের করুণার ওপর অথবা অসহায় হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করে। কৃষকের এই গ্লানিময় জীবন শুধু আর্থিক নয়, এটি একটি সামগ্রিক সামাজিক বৈষম্যের ফল। অনুদাতা ২২% কৃষক জনগোষ্ঠী অপুষ্টিতে এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১